কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

মার্চ ৮৩

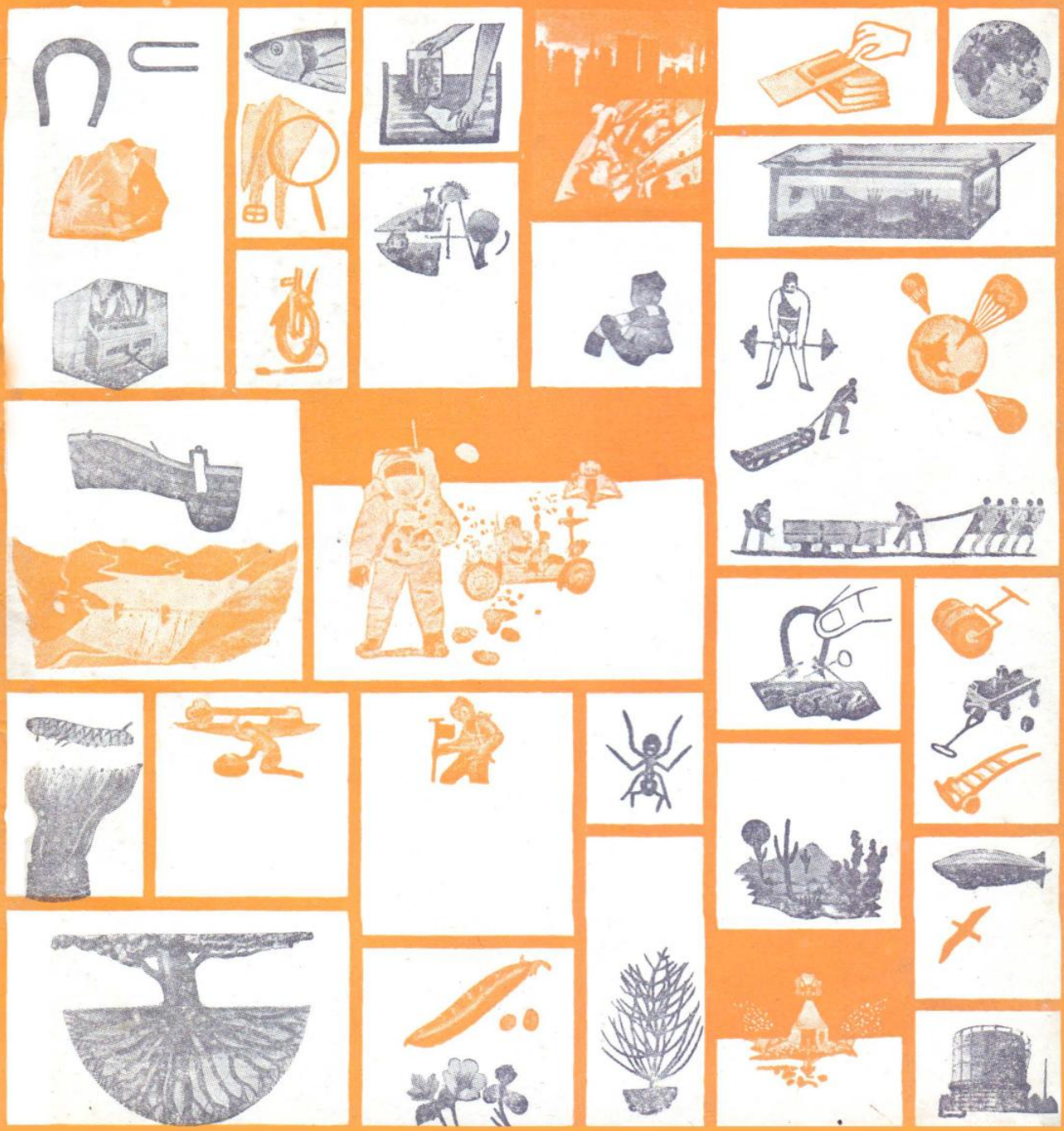

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

বিশেষ সম্পাদকীয়

গভীর বেদনা, অশেষ প্রেরণা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তার তৃতীয় জন্মদিন প্রায় পার হয়ে এল। কোনো পত্রপত্রিকার পক্ষে এটা একটা আনন্দের ব্যাপার। বিশেষ করে এ পত্রিকাটি যদি কোন বিজ্ঞানের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে বর্তমানকালের অত্যন্ত মূল্যবান একটি বিষয়ভিত্তিক হয়, তা হলে আনন্দের সঙ্গে বেশ একটু গর্ব বোধ করাও খুব দোষের নয়। কারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে একাধারে উপভোগ্য, শিক্ষাপ্রদ রচনার খুব কম পত্র-পত্রিকাই বাংলা ভাষায় এযাবৎকাল প্রকাশিত হয়েছে আর যাও বা হয়েছে অকালমৃত্যুই তাদের প্রায় সকলেরই হয়েছে পরিণাম। 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' যে এই নিয়তি খণ্ডন করে সগৌরবে তৃতীয় জন্মবার্ষিকীতে পৌঁছেছে এ পত্রিকার উদ্যোক্তা ও অনুরাগীদের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই আশা আনন্দ ও গর্বের কথা।

আজকের দিনে এই আশা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত বিয়োগান্ত বিমূঢ়-করা আকস্মিকতা মর্মান্তিক শোক ও বেদনা হয়ে মিশে আছে। এ শোক বেদনা কিসের বিশদ করে তা বলবার দরকার নেই। এ পাতায় মুদ্রিত ছবিটি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর পরম সৌভাগ্য এই যে, তার মাসিকরূপে আবির্ভাবের উৎসব-অনুষ্ঠানে তার জয়যাত্রার আশীর্বাদক ও উৎসাহদাতা হিসেবে এমন একজন উপস্থিত ছিলেন যিনি বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে নব নব পরিকল্পনায় ও বিস্তারে শুধু এক অসামান্য কীর্তিমান অগ্রপথিক নন, চরিত্রবৈশিষ্ট্য একান্ত, আস্ফালনহীন বৈদগ্ধ্য, জীবনবোধ ও অনলস কর্মযোগীর বিচক্ষণতা নিয়ে সত্যিই একালের এক প্রবাদ-পুরুষ।

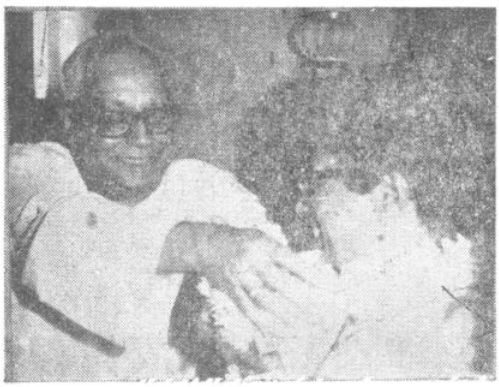

প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানের সভাপতি অশোককুমার সরকার ও প্রধান অতিথি প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর অশোককুমার সরকারের হাতে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তুলে দিচ্ছেন

গভীর বেদনার সঙ্গে যাঁর কথা বলতে গিয়ে ভাষার আড়ষ্টতা বোধ করছি, স্বর্গতঃ সেই অশোক সরকারের কাজের জগতের বাইরের একটা পরিচয় আছে, আর সেই পরিচয়টাই বুঝি সবচেয়ে বড়। যাঁরা তাঁর যৎসামান্য সংশ্রবে কখনো এসেছেন, তাঁরাই জানেন অন্তরে-বাইরে চরিত্রের প্রতি অণুপরমাণুতে ওরকম একান্ত অকপট সৎ ও সহৃদয় মানুষ কল্পনায় ছাড়া বাস্তবে দেখার সৌভাগ্য সত্যিই আশাতীত। তিনি বাঙালী ছিলেন এ আমাদের গর্ব, কিন্তু সেই কি তার যথার্থ পরিচয়? তিনি শুধু বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিলেন। আমাদের মধ্যে ভুল করে এসে পড়া কোনো আদর্শ ভাবী যুগের মানুষ বললে যেন কিছুটা বলা হয়।

এই মানুষকে আমরা অকালে হারিয়েছি, এর চেয়ে বড় দুঃখ আমাদের কিছু নেই। এই মানুষের উদ্দীপনাময় প্রেরণা ও শুভকামনা যে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তার' যাত্রারম্ভে পেয়েছে এর চেয়ে বড় পাথেয়ও তার কিছু হতে পারে না।

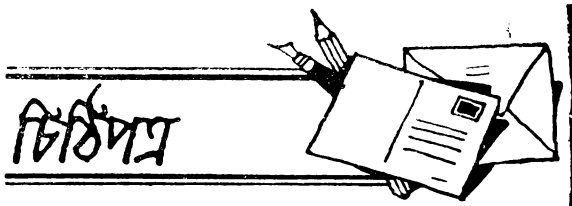

প্রসঙ্গ ঃ এশিয়াড 1982

ডিসেম্বর 19৪2 সংখ্যায় মঞ্জিল সেনের 'এশিয়াড 1982' নিবন্ধে লেখা হয়েছে সেবার (1962) ফুটবলে ভারত সোনা পেয়েছিল। কিন্তু লেখা উচিত ছিল সেবারও কথাটি। কারণ 1951 সালে প্রথম এশিয়ান গেমস্-এ ভারত আগেই ফুটবলে সোনা পেয়েছিল।

দীপক গুহ ঠাকুরতা, 47/9 পি কে গুহ লেন, কলি—28

প্রসঙ্গ ঃ গ্রহের রাজা বৃহস্পতি

ডিসেম্বর 1982 সংখ্যায় বিমান বসু রচিত 'গ্রহের রাজা বৃহস্পতি' নিবন্ধটি পড়ে আমাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু উক্ত সংখ্যার 29 পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের 12 লাইনে লেখা হয়েছে—'পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণে বৃহস্পতির বায়ু-মণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পাওয়া যায় শূন্য ডিগ্রীর নিচেও 120 ডিগ্রী সেলসিয়াস।' আমরা মনে করি এই তাপমাত্রা—120° সেলসিয়াস হওয়া উচিত।

শ্যামল, অজয় ও ফাল্গুনী মিশ্র, গ্রাম ও পোঃ সারেঙ্গা, বাঁকুড়া।

'শূন্য ডিগ্রীর নিচে 120° সেলসিয়াস' কথাটির অর্থই হচ্ছে—120° সেলসিয়াস।

প্রসঙ্গ ঃ শরীর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

জানুয়ারী 1983 সংখ্যায় আপনারা লিখেছেন 'এই সংখ্যা থেকে শরীর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে একটি নতুন বিভাগ শুরু হচ্ছে।' কিন্তু উক্ত সংখ্যায় ঐ বিষয়ে কোনো লেখা দেখতে পেলুম না।

সুরেন্দ্রনাথ সাহু, গ্রাম ও পোঃ বড়চারা, মেদিনীপুর।

জানুয়ারী 83 সংখ্যার প্রকাশিত 'শীতের ভয়' লেখাটি 'শরীর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা' বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের লেখা প্রতিমাসেই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গ ঃ আই-কিউ পরীক্ষা

ডিসেম্বর 1982 সংখ্যায় প্রকাশিত 'আই-কিউ' পরীক্ষা' লেখাটিতে দ্বিতীয় সারির দশম লাইনে $N \neq M$ এবং অষ্টাদশ লাইনে $\therefore T \neq O$ হবে।

দেবাশিস কর, ঠাকুরবাটি স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, হুগলী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬.

স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের

অঙ্ক ও ধাঁধার খেলা ১০.

সম্পাদনা করেছেন ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ

অমরনাথ রায়

জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ৫.

অরূপরতন ভট্টাচার্য

রোবোট এল কেমন করে ৬.

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের সম্পদ ৮.

অমরনাথ রায়

সায়েন্স ক্যুইজ ১০.

সমরজিৎ কর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫.

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

2য় বর্ষ 11ম সংখ্যা ॥ 1983

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

মার্চ মাসের গোড়া থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যারা এ বছর পরীক্ষা দিচ্ছ, তারা সকলেই ভালোভাবে প্রস্তুত হয়েছ আশা করি। বিদ্যালয়-জীবনের শেষে এই পরীক্ষা তোমাদের ছাত্রাবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরীক্ষায় তোমাদের সকলের সাফল্য কানা করি।

গত 4-20 ফেব্রুয়ারী ময়দানে যে কলিকাতা পুস্তকমেলা হয়ে গেল, তাতে গত বছরের মতো এবারও 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর একটি পৃথক স্টলে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা ধরনের বই ও পত্রপত্রিকা রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক ও বিজ্ঞানানুরাগী সাধারণ মানুষের যে সমাগম এবং বিজ্ঞানের বই ও পত্রপত্রিকা কেনার যে আগ্রহ দেখেছি, তাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। দেশের কিশোর সমাজ ও সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার যে প্রয়াস আমরা করছি, তাতে এই সহানুভূতি ও সমর্থন অনেকখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

সূচীপত্র

বিশেষ সম্পাদকীয়

গভীর বেদনা, অশেষ প্রেরণা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 1

চিঠিপত্র 2

সম্পাদকীয় 3

বিজ্ঞান-সংবাদ 4

দপ্তর থেকে

কাকাবৌকিয়া ॥ সমরজিৎ কর 5

সশ্রদ্ধ প্রণাম 7

বিজ্ঞান বিচিত্রা 8

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

এক টুকরো পাথর ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 19

পড়াশোনা

তিনটি সুপরিচিত গ্যাস ॥ অমরনাথ রায় 17

জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাস 23

তিন সমস্যার একটি ॥ নন্দলাল মাইতি 27

তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক J ॥ বিবেক রায় 49

ছবিতে গল্প

জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার : প্রচ্ছদ 2, 3

ছবির মজা ॥ প্রণব হোড় 14

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 16

ভানুবাবুর লজ্জাফাঁদ ॥ উজ্জ্বল ধর 32

পশুপাখীর গল্প

অবলুপ্তির পথে যে পাখী ॥ প্রদীপকুমার দাস 9

মৌমাছি উপাখ্যান ॥ হীরক দাশ 13

উপন্যাস

অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 33

জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

শরীরের শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রণ ॥ সিদ্ধার্থ রায় 25

বায়োলজিক্যাল ক্লক ॥ শ্রীধর সেনাপতি 31

সীমান্তের গ্রহ : নেপচুন ও প্লুটো ॥ বিমান বসু 37

পুনর্জীবিত উদ্ভিদ ॥ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 41

দাঁতের শোভা ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 44

তড়িৎ-লেপনের সহজ কথা ॥ স্নিগ্ধ মজুমদার 45

প্লাষ্টিকের অবদান ॥ দিলীপকুমার সরকার 46

বিজ্ঞানের বিস্ময়

টুংগুস্কার আজব ঘটনা ॥ শচীনাথ মিত্র 29

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

অমর বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্ন ॥ অমলেন্দ্রনাথ ঘটক 42

আবিষ্কারের গল্প

আয়োডিনের জন্ম ॥ ননীলাল দে 11

ছোটদের দপ্তর

বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 51

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর 52 : প্রশ্নোত্তর 52

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা 52

খেলনা ওয়্যারলেস ॥ দেবাশিস কর্মকার 54

শব্দ দূষণ ॥ সুব্রত ঘোড়ই 54

জানার কথা ॥ সুধীরকুমার দাস 53

ম্যাজিক ॥ মানসকুমার সাহা 53

হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল 56

বিজ্ঞান-সংবাদ

পাঁশকুড়ায় বিজ্ঞান আলোচনাচক্র

গত 25 ও 26 ডিসেম্বর পাঁশকুড়ার ব্রাডলি বার্ট হাই-স্কুলে স্থানীয় ফোটান সায়েন্স সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত কিশোর কল্যাণ পরিষদের বার্ষিক শিক্ষাশিবিরের দ্বিতীয় দিনে 'বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদান প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত ঘোড়ই।

চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞানক্লাব সম্মেলন

গত 28-30 ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরের বি. পি. সি. ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজিতে নদীয়া জেলা সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতির উদ্যোগে এবং পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সংস্থার পরিচালনায় চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 52টি বিজ্ঞান ক্লাবের 195 জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার ফুলিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল চক্রবর্তী এবং স্বাগত ভাষণ দেন অতিথি সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এল এস মণ্ডল। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মণি দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, শংকর চক্রবর্তী ও মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সকল প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের নিয়ে এক বিশাল মৌন পদযাত্রা কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিনিধিরা তাঁদের বাৎসরিক কাজকর্মের প্রতিবেদন পেশ করেন। তৃতীয় দিনে 'ভারতে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন' এবং 'বিজ্ঞান ক্লাবের কাজকর্মে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা' বিষয়ে দুটি আলোচনা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দীপক দাঁ, প্রদ্যোৎ রায় প্রমুখ। তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন উপলক্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ

গত 26 জানুয়ারী সরসুনা হাইস্কুলে আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ তারকমোহন দাস এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ অলোক সেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ দীপঙ্কর রায়, সমরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। প্রারম্ভে সংসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী।

নেতাজীভবনে বিজ্ঞান আলোচনাসভা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 86তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজী-ভবনে আয়োজিত চতুর্থ সর্বভারতীয় নেতাজী সম্মেলনের তৃতীয় দিনে 25 জানুয়ারী 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকা' সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পরিচালনা করেন শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর এবং রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটি আলোচনায় (সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে) যোগদান করেন ডঃ অলোক সেন এবং শ্রীবন্দনা রায়চৌধুরী।

আচার্য প্রিয়দারঞ্জন রায় স্মরণসভা

প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ও বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের অগ্রনায়ক প্রয়াত আচার্য প্রিয়দারঞ্জন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যে গত 27 জানুয়ারি কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে একটি স্মরণসভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুশীল-কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রিয়দারঞ্জনের চরিত্রমাধুর্য, রসায়ন শাস্ত্র ও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তাঁর বিরাট অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানান ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ডঃ শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী রোহাৎগীমুখার্জী, ডঃ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয়দারঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর সমগ্র রচনাসমূহের একটি সংকলন প্রকাশ এবং তাঁর নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

দপ্তর থেকে

কাকাবেকিয়া

সমরজিৎ কর

বছর পনের আগের ঘটনা। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যানফোর্ড সাইগেল ব্যাপারটা দেখে চমকেই উঠেছিলেন। ওয়েলসের দুর্গবাড়ি। নাম হারলেখ। বহুদিনের পুরানো সেই দুর্গবাড়ির দেওয়াল থেকে কিছুটা মাটির নমুনা নিয়ে এলেন। সাইগেল মতবলটা খুবই সাধারণ। ওই মাটির মধ্যে কী কী জীবাণু থাকতে পারে, সেটা পরীক্ষা করে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তা পরীক্ষার কাজটিও ছিল খুব সাধারণ। মাটির নমুনায় তিনি মিশিয়ে নিলেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইডের গাঢ় দ্রবণ। তারপর অণুবীক্ষণের নিচে মাটির মধ্যে মিশে থাকা বিভিন্ন জীবাণুর অবস্থা কেমন দাঁড়াল, লক্ষ্য করতে লাগলেন তিনি।

অবাক কাণ্ড! ব্যাপারস্যাপার দেখে সাইগেলের চোখ কপালে উঠল! তিনি দেখলেন, অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইডের সংস্পর্শে এসে ওই মাটির মধ্যে মিশে থাকা বেশির ভাগ জীব-কোষ (জীবাণু) কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বংশবিস্তারের কোন লক্ষণ নেই। কোষের স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস সব কিছুই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইডের সান্নিধ্যে এমনটি যে ঘটবে তা তিনি অবশ্য জানতেন। তাঁর চমকের কারণটি অন্য। ওই মাটির নমুনার মধ্যে মিশে ছিল নানারকম জীবাণু। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর জীবাণু—হ্যাঁ, দেখতে কতকটা তারামাছের মতো। প্রত্যেকের গায়ে সূক্ষ্ম বোঁটা। উদ্ভিদ কোষ বলেই মনে হল যেন। আয়তন এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের দুই ভাগ মাত্র। সাইগেল দেখলেন, অন্য সব জীবাণুর মধ্যে একমাত্র তারাই যেন ব্যতিক্রম। গাঢ় অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইড দ্রবণ তাদের বংশবৃদ্ধি মোটেই রোধ করতে পারে নি। জীবনের সমস্ত ধর্ম তাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ।

অন্যান্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললেন সাইগেল। তাঁর কথা শুনে সবাই বললেন, আশ্চর্য! এমন ঘটনার কথা আমরা কখনো তো শুনি নি। গাঢ় অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইডের দ্রবণে কোন জীবকোষের তো বেঁচে থাকার কথা নয়?

শেষ পর্যন্ত খবরটা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম বিজ্ঞানী অধ্যাপক এলসো বারঘুরন-এর কাণে। সাইগেলের অভিজ্ঞতার কথা শুনে তিনি বললেন, অদ্ভুত তো! ঠিক এইরকম জীবাণুরই জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছি আমি পাথরের স্তরে। সেই জীবাশ্মের বয়স কম করেও দুশ কোটি বছর অর্থাৎ আজ থেকে দু'শ কোটি বছর আগে তারা পৃথিবীতে বাস করত। পাথরের স্তরের ভেতর তাদের এখন পাওয়া যায় জীবাশ্ম অবস্থায়। আমাদের ধারণা কোটি কোটি বছর আগেই পৃথিবীর বুক থেকে তারা অবলুপ্ত হয়েছে। এতদিন ধরে তাদের বংশধরদের তো বেঁচে থাকার কথা নয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বারঘুরনের এই ধারণা ঠিক নয়। সাইগেল প্রমাণ করলেন, দু'শ কোটি বছর আগের সেই জীবাণু মোটেই অবলুপ্ত হয় নি। তাদের বংশধর এখনও জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, জৈবিক বিবর্তনে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটেছে কত রকম প্রাণী এবং উদ্ভিদ্। সময়ের সঙ্গে তাদের মধ্যে এসেছে কত রকম পরিবর্তন। ডানা মেলে যে সব পাখি এখন আকাশে উড়ে বেড়ায়, কোটি কোটি বছর আগে আগে তাদের অনেকে পৃথিবীর বুকে সরীসৃপের মত বিচরণ করত। এখনকার টিকটিকি অথবা গিরগিটি একসময়কার অতিকায় আয়তনের প্রাণীর বংশধর বলে অনেকে অনুমান করেন। অথচ এই যে জীবাণু, জীবন্ত অবস্থায় যাদের আবিষ্কার করলেন সাইগেল, কোটি কোটি বছর ধরে কিভাবে তাদের বংশ গতি বজায় রাখল, বিজ্ঞানীদের কাছে এখন সেটা একটা বড়রকমের একটি বিস্ময়! এ যেন এক জ্যান্ত জীবাশ্ম। 'এ লিভিং ফসিল' বলেছেন বারঘুরন।

বারঘুরনের আবিষ্কারের ঘটনাটিও কিন্তু কম আশ্চর্যজনক ছিল না। নতুন নতুন জীবাশ্মের সন্ধান করতে গিয়ে বছর কয়েক আগে ওনটারিও-র কাকাবেক নামে একটি জায়গায়, এখানে আবিষ্কার করলেন তিনি এক ধরনের চকমকি পাথর। 'ফ্লিন্ট রক'। সেই পাথরের গায়ে তিনি দেখলেন এক ধরনের চিহ্ন। দেখতে ছাতার মতো। বারঘুরন পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, ওরা আসলে এক শ্রেণীর জীবাণুর জীবাশ্ম। ওই জীবাণুর তিনি নাম রাখলেন 'কাকাবেকিয়া আমব্রেলাটা'। যার অর্থ কাকাবেকিয়া থেকে পাওয়া ছাতার মতো জীবাণু। জানা গেল, ওই পাথরের স্তরে তৈরি হয়েছিল 'প্রিক্যামব্রিয়ান' যুগের মাঝামাঝি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে। বোঝা গেল, এক শ্রেণীর প্রাচীনতম জীবাণুর জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন

বারঘুরন। সাইগেল বুঝলেন, তিনি যে জীবাণু আবিষ্কার করেছেন, তার জৈবিক ইতিহাস হয়তো ওই জীবাশ্মের মধ্যেই পাওয়া যাবে। বারঘুরনের সম্মানে নিজের আবিষ্কৃত জীবাণুর নাম রাখলেন সাইগেল 'কাকাবেকিয়া বারঘুরনিয়ানা'।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা এত জায়গা থাকতে হারলেখ দুর্গের মাটিতে জীবাণু সন্ধানে কেন হাত দিলেন সাইগেল?

তা হলে বলি, শোন, সেটাও এক মজার ব্যাপার। নানারকম জীবাণু নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই গবেষণা চালাচ্ছিলেন সাইগেল। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, আচ্ছা, আজকের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান তো নাইট্রোজেন এবং অকসিজেন। কিন্তু চিরকাল তো এমন ছিল না। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাতাসের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল অ্যামোনিয়া গ্যাস। এখন যেমন দেখা যায় বৃহস্পতি গ্রহের বাতাসে। সাইগেল ভাবলেন, ধরা যাক, পৃথিবীর আবহাওয়ায় এখনও প্রচুর পরিমাণ অ্যামোনিয়া বিরাজ করছে। এই পরিবেশে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদকে যদি রেখে দেওয়া যায়, কেমন দাঁড়াবে তাদের অবস্থা?

তা না হয় ভাবা গেল। কিন্তু অ্যামোনিয়া রয়েছে এমন পরিবেশে তিনি পাবেনই বা কোথায়? হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, আছেই তো। মাটিই তো সেই পরিবেশ। এমন মাটি, যেখানে নিয়মিত প্রস্রাব গিয়ে পড়ে। প্রস্রাবে ভেজা মাটিতে থাকে প্রচুর অ্যামোনিয়া। তার মধ্যে জীবাণুও তো থাকতে পারে? আর সত্যিই যদি থাকে, সেই মাটির সংস্পর্শে জীবাণুর শারীরিক অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় পরীক্ষা করলে নিশ্চয় তা জানা যায়?

এই ভাবনা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সাইগেল এক সময় এসে হাজির হলেন হারলেখের দুর্গবাড়িতে। দেখলেন, সেখানে সব সময়ই ভ্রমণার্থীর ভীড়। শুনলেন দুর্গবাড়ির দেওয়ালের পাশেই তাদের প্রস্রাবখানা। ঠিক করলেন, এখানকার মাটিই পরীক্ষা করবেন তিনি। করলেনও। করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেই জীবাশ্ম-জীবাণু। দেখলেন, অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইড দ্রবণে ওই জীবাণুগুলি দিব্বি বেঁচে রয়েছে। সাইগেল বুঝতে পারলেন, এমন এক ধরনের জীবাণু আবিষ্কার করেছেন তিনি, যারা অ্যামোনিয়া ছাড়া কখনোই বাঁচতে পারে না।

সাইগেলের আবিষ্কৃত সেই জীবাণু 'কাকাবেকিয়া আমব্রেলাটা' নিয়ে গত পনের বছর ধরে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। জানা গেছে, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সমুদ্রতল থেকে বেশ কিছুটা উঁচু জায়গা ছাড়া আর কোথাও কাকাবেকিয়া তেমন চোখে পড়ে না। নিরক্ষ অঞ্চলেও এদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এক মাত্র 6500 ফুট অথবা তার চেয়ে উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। এখানকার তাপমাত্রা কম। তাই মনে হয়েছিল, নিম্ন তাপমাত্রাতেই এরা বাঁচতে পারে। কিন্তু পরে হাওয়াই-এর নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরি 'মলাকিয়া'য় পাওয়া গেল ভিন্নতর অভিজ্ঞতা। সেই আগ্নেয়গিরির 10000 ফুট উচ্চতায় আবহাওয়ার তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেখা গেছে, সেখানে কাকবেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত বেশি। এথেকে মনে হয়, বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার মতো ক্ষমতাও তারা অর্জন করেছে। প্রজাতি অনুযায়ী তাদের চেহারাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন, কারোর মাথায় থাকে ছাতার মতো টুপি, কারোর সঙ্গে ছড়ি অথবা বোঁটার মতো প্রত্যঙ্গ। বাতাসের অক্সিজেন এদের ক্ষতি করে না। এরা বেঁচে থাকে ক্ষারকীয় বা 'অ্যালকালাইন' পরিবেশে। ক্ষার হিসেবে এরা ব্যবহার করে সোডিয়াম হাইড্রকসাইড অথবা অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইড। এদের কোষপ্রাচীরে থাকে সিলিকন। কিভাবে এই সিলিকন এরা সংগ্রহ করে, বিজ্ঞানীরা এখনও তা জানেন না। এদের দৈহিক বৃদ্ধির হার কম। বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন শক্তি। সে শক্তিই বা কিভাবে এরা সংগ্রহ করে সেকথাও এখনও জানা সম্ভব হয় নি। এই জীবাণুদের নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন। বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন, এসব প্রশ্নের উত্তর জানা গেলে আদিকাল থেকে জীবজগতে কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে অনেক কথাই হয়তো আমরা জানতে পারব।

সশ্রদ্ধ প্রণাম

গত 22 ফেব্রুয়ারী 1983 জীবনীকার হিসাবে সর্বজন-পরিচিত মণি বাগচি মহাশয়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। তাঁর জন্ম 1907 খ্রীষ্টাব্দে। নবদ্বীপে তাঁর স্কুলজীবন কাটে। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। বি. এ. পাশ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসেবা তাঁর ব্রত হয়ে উঠল। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তাঁর লেখনী চালিত হয়েছে অক্লান্ত-ভাবে।

মণি বাগচি মহাশয় গত তিরিশ বছরে 125 খানির মত জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। রামমোহন, মাইকেল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, আচার্য যদুনাথ প্রমুখ বাঙালি মনীষীদের জীবনী, আনন্দ কুমারস্বামী (ইংরেজি গ্রন্থ), সি. ভি. রমন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ভারত-গৌরবদের জীবনালেখ্য তাঁর কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর 'জীবনীশতক' বস্তুত গ্রন্থখানিতে 104টি জীবনালেখ্য আছে—দেশবিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান পরিচয় আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজ ধরে
আমরাও হব বরণীয়।'

—এই মহাসত্যকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। যথার্থত তিনি মহৎ জীবনীকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশনা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ত্রিদিবেশ বসু মহাশয় গত 16 ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার প্রখ্যাত সাংবাদিক, বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী অশোককুমার সরকার মহাশয় গত 17 ফেব্রুয়ারী লোকান্তরিত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থসম্ভারকে সার্থক প্রয়াসে বিশ্বের গ্রন্থ-বিপনন ক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়ায় কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত 18 ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেছেন।

প্রখ্যাত রসায়নবিদ্, সুশিক্ষক, কীর্তিমান লেখক, পশ্চিম বঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 93 বৎসর বয়সে গত 18 ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলা ভাষাকে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহার করার জন্যে তাঁর প্রয়াস স্মরণীয়।

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র পক্ষ থেকে আমরা প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

সৌর শক্তিচালিত যান

সোভিয়েত রাশিয়ায় তুর্কমেনিয়ার রাজধানী আশ্‌খাবাদের রাস্তায় অদ্ভুত চেহারার একটি মিনিবাস চলতে দেখা যায়। মিনিবাসের ছাদে রয়েছে 700 ওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন ক্ষুদ্রাকার একটি সৌর পাওয়ার-স্টেশন। এটির সাহায্যে সৌর শক্তি রূপান্তরিত হয় বিদ্যুতে এবং সেই বিদ্যুৎ মিনিবাসের নিকেল-দস্তা-স্টোরেজ ব্যাটারিকে চার্জ করে।

এই মিনিবাস রওনা হবার সময়ে কোনো ঝাঁকুনি লাগে না এবং চলবার সময়ে কোনো শব্দ না। গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই যান গ্যাস নিঃসরণ করে না, এই কারণে আবহাওয়াকেও দূষিত করে না। স্টোরেজ ব্যাটারির পাল্লা কম করেও 100 কিলোমিটার।

সৌরশক্তি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তুর্কমেনিয়ার সেই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলক এই মিনিবাসটি তৈরী করেছেন। বিশেষ করে তুর্কমেনিয়াতেই যানটি তৈরি হয়েছে এই কারণে যে, এখানে বছরে 240 দিন রোদ পাওয়া যায়।

বাসের ছাদে স্থাপিত সৌর পাওয়ার-স্টেশনটি ধাতু জোড়া দিয়ে তৈরী। তাতে আছে চোঙাসদৃশ কাঁচের টিউব, টিউবের অভ্যন্তরে আছে সিলিকন ফোটো-এলিমেণ্ট। টিউব থেকে বাতাস বার করে দেওয়া হয়েছে এবং হাইড্রোজেন ভরা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় সৌর শক্তি সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়।

সৌর পাওয়ার-প্লাণ্ট

সোভিয়েত ইউনিয়নে 1983 সালে বিশ্বের বৃহত্তম ও অদ্বিতীয় সৌর পাওয়ার-প্লাণ্টের নির্মাণকার্য শুরু হচ্ছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদনের এই কারখানাটি হবে 32oo,ooo কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন। এটিতে থাকবে একটি সমতল কিনারবিশিষ্ট স্তম্ভ আর তাকে ঘিরে কয়েক হেক্টর-ব্যাপী ঝকঝকে আয়না। এই নিয়ে গঠিত হবে সূর্যের দিকে সদানিবদ্ধ ক্ষেত্র।

আয়নার সংখ্যা 72,ooo এবং প্রত্যেকটির আয়তন 49 বর্গমিটার। কম্পিউটারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই আয়নাগুলো সূর্যমুখী ফুলের মতো সব সময়েই সূর্যের দিকে নিবদ্ধ থাকবে এবং সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করবে বাষ্পীয় জেনারেটরের পার্শ্বে। একদিনের মধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সঞ্চিত হবে এমন বিপুল পরিমাণ অতি-উত্তপ্ত জল, যার সাহায্যে রাত্রিবেলা টার্বো-জেনারেটরের ব্লেড ঘোরানো যাবে এবং মেঘলা আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

সূর্যনিবদ্ধ ক্ষেত্র (আয়নার সারি) তৈরি করার জন্য বিশাল জমির প্রয়োজন হয়। এই জমিতে [illegible] ক্ষেত্র তৈরি হবে চাষের অনুপযোগী জমিতে

রোবোটের বিচিত্র আচরণ

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, জাপানে একটি অভূতপূর্ব অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। একটি রোবোটে একজন মানুষকে খুন করেছিল। ঘটনাটি এইরকম: রোবোটে কিছু দোষ দেখা দেয়, সেই দোষ সারিয়ে তোলার পরে রোবোটের মেকানিক সুইচ [illegible] বন্ধ করতে ভুলে যায়। [illegible] হাত বাড়িয়ে মানুষটিকে আঁকড়ে [illegible] পাতের মতো তাকে ঢুকিয়ে দেয় [illegible] চালু-থাকা অংশে। এই [illegible] সম্বন্ধে সারা বিশ্ব শিউরে উঠেছিল। [illegible] করেছিল 'সাইবারনেটিক্‌স্-এর জনক' নরবার্ট ভীনার-এর এই ভবিষ্যৎবাণী যে, হিরোসিমায় দুঃস্বপ্নের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠবে রোবোটের বিজয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অবশ্য কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, জাপানে আজ হাজার হাজার রোবোট কাজ করছে এবং এই রোবোটদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর রোবোটের দাম ক্রমেই কমছে। শিল্পক্ষেত্রে রোবোটদের আদর্শ শ্রমিক বলে মনে করা হয়। কারণ রোবোটরা কখনো ধর্মঘট করে না, কখনো বেতন-বৃদ্ধি দাবি করে না, কখনো কাজের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যে আওয়াজ তোলে না। রোবোটরা কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয় না।

অবলুপ্তির পথে যে পাখী

প্রদীপকুমার দাস

মানুষের লোভের শিকার হয়ে বহু জীবজন্তু ও পাখী ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে ও হতে চলেছে। এখানে কয়েকটি পাখীর কথা আলোচনা করছি, যারা আজ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

ডো-ডো—এক ধরনের পায়রা। তবে এরা সাধারণ পায়রাদের মতো উড়তে পারে না। ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী

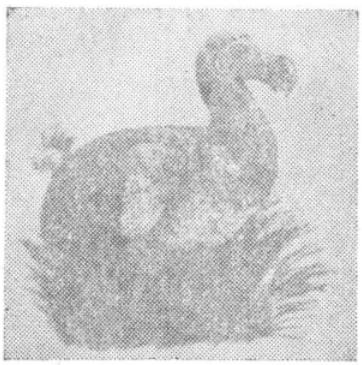

ডোডো

মোরিটিয়াস দ্বীপে এদের নীড়। পর্তুগীজ নাবিকেরা সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়ার সময় কোন এক অবসর মুহূর্তে মোরিটিয়াস দ্বীপে পা দেয়। খাদ্যের অন্বেষণে ডো-ডোকেই বেছে নেয়। এরপরে ওলন্দাজ, ফ্রান্স, ইংরেজ নাবিকরাও এদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। ডো-ডো পাখী আকারে বেশ বড়সড়। ওজন প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড। এদের মাথা খুব বড়। মাথার সামনে দীর্ঘ নয় ইঞ্চি তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাঁকানো চঞ্চু। পা দু'টো ছোট। হলদে রঙের। পায়ের পাতা প্রশস্ত। পুচ্ছের অংশ খুবই সামান্য। হলদে সাদাটে রঙের, মুখের চামড়া ও গায়ের পালক ধূসর রঙের। রডরিগুউজ ডো-ডো পাখীর গড়ন হালকা ধরনের। লম্বা গ্রীবা, গায়ের রঙ ধূসর-বাদামী, ডানার অগ্রভাগে বলের মতো গোলাকার অংশটিকে মারামারির সময় কাজে লাগায় এরা। খুব জোরে দৌড়তে পারে। তাই এদের ধরা খুব একটা সহজ নয়। ডো-ডো-এর ডিম বানরের প্রিয় খাদ্য, ডো-ডো পাখী শূকরের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এদের আচারব্যবহার সম্বন্ধে খুব একটা ভালো জানা সম্ভব হয় নি। কেননা এই ধরনের পাখী আর নেই বললেই চলে। 1681 সালের মধ্যে মানুষের দুর্বার খাদ্য-লালসা এদের অবলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়।

অস্ট্রিচ – সবচেয়ে বড় ডুবো পাখী। আকাশে উড়তে পারে না। দক্ষিণ ইউরোপ, এশিয়ার গোবী মরুভূমি ও আফ্রিকার প্রায় সব জায়গায় এবং সাহারা মনুভূমিতে এদের বাস। একটা পরিণত অস্ট্রিচ পাখীর ওজন প্রায় 345 পাউণ্ড। লম্বায় 7-8 ফুট। লম্বা গলা। ছোট মাথা। মাথার সামনে প্রশস্ত চঞ্চু। খুব বড় চোখ, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সারা দেহ, ডানা ও পুচ্ছের অংশ ঢাকা থাকে নরম পালকে। দেহের পালক কালো রঙের, এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সতর্ক, ক্ষীপ্র গতিসম্পন্ন। চোখে ধুলো দেয় অনায়াসে, নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আত্মগোপন করতে পারে। ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন হওয়ার জন্যে অনেকে দৌড়ে এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না, ঘণ্টায় প্রায় একটানা চল্লিশ মাইল দৌড়তে পারে। বিপদে পড়লে এর চেয়েও বেশি গতিতে দৌড়তে পারে। এদের প্রত্যেকটি পায়ে দুটো আঙ্গুল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এরা ঘোড়ার মত লাফাতে পারে এবং ঐ পায়ে লাথি মেরে সিংহকেও পর্যন্ত ঘায়েল করার শক্তি ধরে। এদের গলার কণ্ঠস্বরও সিংহকে হার মানায়। যেমন জোরালো গর্জন করতে পারে, তেমনি হিস্ হিস্ শব্দ করতে পারে ডাইনোসরের মতো। স্নান করতে এরা খুব ভালবাসে। যেখানেই জলাশয়ের সন্ধান

অস্ট্রিচ

পায় সব কাজ ভুলে অবগাহনে মেতে যায়। এরা পোষ মানে। পোষ মানিয়ে গাড়ি টানানো যায় এদের দিয়ে। এদের গায়ের পালক খুব দামী। ডানার ও পুচ্ছের পালক গহনা হিসাবে বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সব পালকের গহনা কেবল ছেলেরাই বৈবাহিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করত। এদের দেখাদেখি মেয়েরা সাজপোষাকে ও মাথার টুপিতে এই পালক ব্যবহার করতে শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ট্রিচ পাখি পাবার জন্যে ফার্ম খোলার হিড়িক পড়ে যায়। পালক বিক্রির ধুম পড়ে যায়, কুড়ি টন পালক বিক্রি হয় কুড়ি লক্ষ ডলারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এই অস্ট্রিচ পাখি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শুধুমাত্র সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে এদের পালক ব্যবহারের জন্যে।

ইমুস—বড় ধরনের পাখী। তবে এরা উড়তে পারে না। অস্ট্রেলিয়ায় এদের বেশি দেখা যেত। ওখানকার গ্রাম্য লোকেরা এই পাখীদের শিকার করত খাবারের জন্যে। ক্ষেতের ফসল এরা খুব নষ্ট করত। 1919 সালে অস্ট্রেলিয়ায় এইসব পাখীদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে কৃষকেরা তাদের সরকারের কাছে আবেদন জানায় এদের মেরে ফেলার জন্যে। 1932 সালে তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ার সরকার এদের মেরে ফেলার জন্যে মেসিন গ্যান সহ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করেন। 1945 সাল থেকে 1949 সাল পর্যন্ত সরকার একটি করে ইমুস পাখী মারার জন্যে এক শিলিং পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইমুস

সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা 70,814 টি ইমুস পাখী মেরে ফেলে। এইভাবে একটি প্রজাতির ধ্বংস ঘটে। বাস ঘন ঝোপ-ঝাড়ে অথবা গাছের ডালে, ছেলে ইমুসইরে কাজ বেশি। এরা ডিমে তা দেয় 8 থেকে 63 দিন পর্যন্ত। 7-11 টা শিশুপাখীর রক্ষণাবেক্ষণও এদের কাজ। পুরুষ ইমুসের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ ও মোটা। মেয়ে ইমুসের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জোরালো। এদের ডাকে এক ধরনের প্রতিধ্বনি ভেসে ওঠে। এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। ঘণ্টায় প্রায় 30 মাইল অতিক্রম করতে পারে।

কিউই—এক ধরনের ছোট্ট পাখী,। মুরগীছানার মতো দেখতে। এরা উড়তে পারে না। নিউজিল্যাণ্ডে

কিউই

সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, বাসস্থান এদের ভিজে স্যাঁত-স্যাঁতে বনজঙ্গলে। নিশাচর, দিনের বেলায় এরা বেরোয় না। কুকুর, বিড়ালের অত্যন্ত প্রিয় শিকার এরা। এদের পা ও পায়ের পাতা দুটো দেহের তুলনায় অত্যন্ত লম্বা। চঞ্চুটিও খুব লম্বা ও স্পর্শকাতর। চঞ্চুর সাহায্যে এরা সহজেই মাটি থেকে ছোট ছোট ক্রিমি অনায়াসেই তুলে নিতে পারে। এরা একসঙ্গে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। এই প্রজাতিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

পেঙ্গুইন - সন্তরণ পাখী। এরা সাঁতার কাটতে পারে, উড়তে পারে না। প্রায় 15 টি বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। নীড় এদের দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলিতে, আণ্টারটিকার তীরে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপগুলো। বক্ষ পিঞ্জরের শক্ত ডানা দুটো এদের হালের কাজ করে সাঁতার কাটার সময়, পা দিয়ে এরা জল কাটে। শুকনো মাটিতে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বরফের উপর এরা গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটে। তবে এরা মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লাফাতে পারে।

সম্রাট পেঙ্গুইনগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ। আকারে বেশ বড়সড়, উচ্চতায় চার ফুট। ওজনে 75 পাউণ্ড। শীতকালে এরা ডিম পাড়ে সমুদ্রের বরফের উপর। ছেলে পেঙ্গুইনেরই

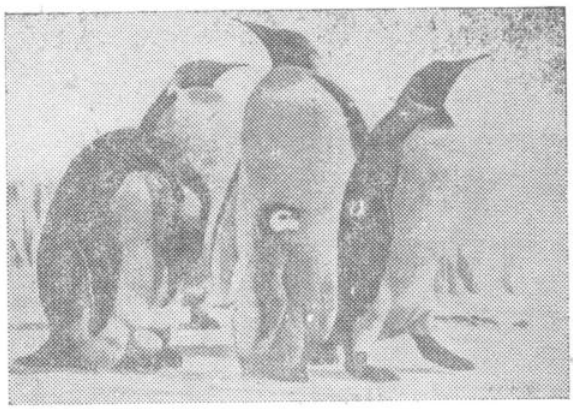

পেঙ্গুইন

উপর ডিমের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। প্রায় দু মাস ছেলে পেঙ্গুইন না খেয়ে ডিমে তা দেয় পায়ের পাতার মধ্যে রেখে ও চামড়ার ভাঁজে গরম করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে বাবা পেঙ্গুইনের কাজ শেষ হয়। সে তখন খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। বাচ্চার দেখাশুনো করে মা পেঙ্গুইন।

অ্যাডিলি পেঙ্গুইন-এর এক ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। বরফ ঢাকা দেশে অ্যান্টারটিকার কূলে এদের পাওয়া যায়। সমুদ্র যাত্রাপথে নাবিকেরা এদের অন্বেষণ করত খাবারের জন্যে। তা ছাড়া শ্লেজগাড়ির কুকুরের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য অ্যাডিলি পেঙ্গুইন। বরফের দেশে শ্লেজগাড়ির প্রচলন বেশি।

তাই মানুষের স্বার্থের শিকার হয়ে এই পাখীরা আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-14

আয়োডিনের জন্ম

ননীলাল দে

হাত পা কেটে গেলে আমরা ঘরে বা ডাক্তারখানায় দৌড়ে গিয়ে টিংচার আয়োডিন লাগাই। আয়োডিন অনেক পুরানো হলেও তার ব্যবহার কিন্তু এখনও কমে যায় নি।

আয়োডিন জীবাণু নাশ করে, অর্থাৎ কোন ক্ষতস্থানে যাতে কোন জীবাণু প্রবেশ করে দূষিত করতে না পারে সেজন্যেই এর দ্বারা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর যদি জীবাণু প্রবেশ করেই থাকে তবে তাকে ধ্বংস করে দেবে। অবশ্য আজকাল এজন্যে 'ডেটল' নামক ঔষধটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর মতো অতটা উচ্চ গুণ-সম্পন্ন নয়। যে সব জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে দেহে নানারকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারে তার মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার নামক রোগটিই মারাত্মক, এতে জীবনহানিরও সম্ভাবনা। এ ছাড়া পূঁজ সঞ্চয় করা ও পচন অবস্থাও যন্ত্রণাদায়ক।

আয়োডিন দেখতে অনেকটা গাঢ় বাদামী রঙের ছোট ছোট অভ্রের টুকরার মতো। খুব মসৃণ ও চকচকে। অ্যালকোহল বা স্পিরিটের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে নেওয়া হয়। আয়োডিন চর্মকে ও অন্যান্য বস্তুকে রঞ্জিত করতে পারে। এজন্যেই এই তরল বস্তুকে বলা হয় টিংচার আয়োডিন।

যুদ্ধের প্রয়োজনে হঠাৎ যেমন অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল, আয়োডিনও তেমনিই আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপোলিয়নের আমলে এক যুদ্ধে ফ্রান্স যখন বিদেশ থেকে বারুদের জন্যে সোরা আমদানি করতে পারল না, তখন তারা সামুদ্রিক উদ্ভিদ পুড়িয়ে সোরা প্রস্তুত করতে লাগলো। এভাবে একদিন সোরা প্রস্তুত করবার সময় 'বার্ণাকুত্তয়' নামে এক বিজ্ঞানী এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করলেন যে, ঐ পাত্র থেকে সুন্দর বেগুনী রঙের বাষ্প নির্গত হচ্ছে। পাত্রের যে অংশ অপেক্ষাকৃত শীতল সে অংশেই এই বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে থাকে। কুত্তয় সেই জমাট বাঁধা রাসায়নিক পদার্থটি পরীক্ষা করবার জন্যে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের হাতে দেন। গেলুম্যাক ও হামফ্রে ডেভি যাঁরা এই রাসায়নিক পদার্থটিকে নিয়ে পরীক্ষা করেন, তাঁরাও প্রায়ই একই সময়ে ঘোষণা করেন যে, এই পদার্থটি একটি মৌলিক পদার্থ তার নাম আয়োডিন। সি উইড বা সামুদ্রিক আগাছা পুড়িয়ে ছাই প্রস্তুত করা হয়, তার নাম কেল্প। এই কেল্প থেকেই আয়োডিন তৈরী হয়। এক টন কেল্প থেকে 34 পাউণ্ড বা প্রায় 18 কেজি আয়োডিন পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার চিলি ও পেরু প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে "সল্ট পিটার" অর্থাৎ অপরিশোধিত "সোডিয়াম নাইট্রেট" পদার্থটি পাওয়া যায়। এই পদার্থ থেকে আজকাল আয়োডিন নিষ্কাশন করা হচ্ছে।

আয়োডিনের কাজ শুধু যে জীবাণু নাশ করা তা নয়। পূর্বে কোন কোন বিষাক্ত জীবাণু ধ্বংস করার জন্যে দেহে আয়োডিন ইনজেকশন দেওয়া হত, রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্যে। এই শ্বেতকণিকা আমাদের দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া রক্তবহা ধমনীর প্রসার করে রক্ত সঞ্চালনের কাজও বৃদ্ধি করে। ফুস্‌ফুসের পুরাতন রোগে আয়োডিনের 1% বাষ্প প্রয়োগে খুব ফলপ্রদ কাজ দেয়। আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ বহু আবর্জনা যা আমাদের রক্তে বা কোষে মিশে থাকে তাদের নির্গত করে দেবার ক্ষমতাও প্রচুর। পৃথিবীতে যত আয়োডিন উৎপন্ন হয় তার শতকরা 70 ভাগ ঔষধরূপেই ব্যবহৃত হয়। শরীরের কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরিষ্কারভাবে ফটো তোলবার জন্যে আয়োডিন মিশ্রিত তেল বা ইনজেকশন ব্যবহৃত করা হত। আয়োডিনকে রঞ্জনরশ্মি ভেদ করতে পারে না। এজন্যে হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস, পিত্তথলি, মূত্রাশয়, ইত্যাদি যন্ত্রাদির ফটো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। অবশ্য বর্তমানে বেরিয়াম সল্ট প্রভৃতি নানা ঔষধ ব্যবহৃত হচ্ছে।

আলোকচিত্রের আরম্ভ থেকেই আয়োডিন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রথম যুগে যখন 'ভ্যাগারো টাইপ' পদ্ধতিতে চিত্র গ্রহণ করা হত, তখনই সিলভার আয়োডাইড মিশ্রিত কাগজে চিত্র মুদ্রিত হত। আজকালও চিত্রগ্রহণে ও ছবি ছাপাবার জন্যে সিলভার আয়োডাইড ও পটাশিয়াম আয়োডাইড নামক দুটি যৌগিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

কাচের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এজন্যে আয়োডিন মিশিয়ে 'পোলারয়েড' নামে যে কাচ তৈরী হয়ে থাকে, তার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয় না। এই কাচ চশমা, মোটরগাড়ি বা আলোর প্রতিরোধক রূপে ব্যবহৃত হয়। আয়োডিনের কাজ এখানেই শেষ নয়।

লোহা ও ইস্পাত শিল্পে আয়োডিন অথবা তার যৌগিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এর স্থানটা এখন কারবন অনেকটা দখল করেছে। গলিত ইস্পাত যখন ক্রমশ শীতল হতে থাকে তখন অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার বুদবুদ থেকে যায়। ইস্পাতের পক্ষে এই বুদ্বুদ ক্ষতিকর। কিন্তু ইস্পাতের গলিত অবস্থায় পটাশিয়াম বা বেরিয়াম আয়োডাইড কিছু পরিমাণে দিয়ে দিলে এই বুদ্বুদ নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া আয়োডিনের বাষ্প ইস্পাতের অনেক আবর্জনা উপরে ভাসিয়ে তোলে, তখন ওগুলোকে সহজে সরিয়ে ফেলা যায়। লোহা ছাড়া আরও অন্যান্য ধাতুও প্রস্তুত করার সময় আয়োডিনের যৌগিক পদার্থ ব্যবহার করে দেখা গেছে সেই ধাতু আরও মজবুত হয় ও মরচে ধরে না। কোন কোন রঙের সঙ্গে আয়োডিন মিশিয়ে কোন কোন যন্ত্রের অংশবিশেষ রং করা যায়। রং করবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই সব অংশকে পুনরায় তাপ দিতে হলে তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রং বদলে যায়। তাপ বেশি বৃদ্ধি হলে কর্মীরা এর দ্বারা প্রথমেই সাবধান হয়ে যেতে পারেন। ছোটখাটো নানারকম যন্ত্রাদি প্রস্তুত করতেও আয়োডিন নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের গলার সম্মুখভাগে যে উঁচু হাড়টি আছে, ঠিক তার নিচে 'থাইরয়েড্' নামে একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি থেকে 'থাইরক্সিন' নামে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়ে সোজাসুজি রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই রসের ক্রিয়ায় আমাদের দেহের গঠন সুন্দর হয়। এ ছাড়া কেশোদগম ও দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। এই থাইরক্সিনের বেশির ভাগ অংশ হলো আয়োডিন। যদি কোন মানুষের উক্ত গ্রন্থির দুর্বলতার জন্যে থাইরক্সিন অর্থাৎ আয়োডিন প্রয়োজনমত নিঃসৃত না হয়, তবে তার দেহের সম্যক পরিপুষ্ট হয় না। এর অভাবে গলগণ্ডের রোগ হয়। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানকার লোকেরা খাবারের সময় নুনের মতো আয়োডিন খেয়ে তার অভাব পূরণ করে। আবার যারা সমুদ্রের তীরবর্তী অধিবাসী তাদের গলগণ্ড রোগ হয় না। কারণ তারা সমুদ্রের জল ব্যবহার করে, কডলিভার তৈল, সি উইড্ অর্থাৎ সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে পরোক্ষভাবে আয়োডিন গ্রহণ করে থাকে।

এই উদ্ভিদগুলো দেখতে স্পঞ্জের মত। আগে এই উদ্ভিদ পুড়িয়ে ছাই-এ পরিণত করে গলগণ্ডের ঔষধ রূপে ব্যবহার করা হত। 1820 সালে জিন ফ্রাক্সয় কয়ডেণ্ট নামে জনৈক চিকিৎসক প্রথমে ব্যবহার করে সুন্দর ফল পেয়েছিলেন। তারপর আয়োডিন আবিষ্কার হওয়ায় সি উইডের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে ও সমাদর বেড়ে যায়।

বালুরডোবা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

মৌমাছি উপাখ্যান

হীরক দাশ

মৌমাছি। সত্যি এক আশ্চর্য প্রাণী বটে। মৌমাছির প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে বিস্ময়। আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলে কি হবে, এর রয়েছে পাঁচ-পাঁচটি চোখ। তিনটে সাধারণ। মাথার উপর ওগুলোর অবস্থান। কিন্তু অন্য দুটো একটু অসাধারণ এবং জটিল। এই দুটোর মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার লেন্স, যার সাহায্যে এরা সূর্য থেকে আগত আলট্রাভায়োলেট রে বা অতি-বেগুনি রশ্মি দেখতে পায়—যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। নাকের ছিদ্রের সংখ্যা নাকি পাঁচ হাজারের মতো! সেসবের সাহায্যে এরা তিন কিলোমিটার দূরের ফুলের গন্ধ অনুভব করতে পারে। পাখনার সংখ্যা সেই চারটে। কিন্তু মজার কথা, ওড়বার সময় তা জুড়ে দুটোয় পরিণত হয়। এই পাখনা মিনিটে প্রায় ষোল হাজার বার কাঁপিয়ে সে উড়ে বেড়ায়। মৌমাছির গুণগুণ শব্দ কবিত্বের উন্মেষ যতই ঘটাক না কেন, খুব কম লোকই আছে যারা এই শব্দে ভয় পায় না। কারণটা হলো এদের বিষাক্ত হুলের জন্য। কিন্তু মৌমাছি এই ব্রহ্মাস্ত্রটি সারা জীবনে মাত্র একবারই ব্যবহার করতে পারে। কারণ হুল ফোটানোর পর শিকারের দেহ থেকে সেই হুলটা বের করে আনতে পারে না। শিকারের দেহে থেকে যায়। আর একবার হারালে মৌমাছির আর নতুন হুল জন্মায় না।

মৌমাছিদের আয়ু মাত্র দেড় দু'মাস। এই ছোট্ট জীবনে তার কিন্তু এক মুহূর্তের অবসর নেই। মৌচাক তৈরি থেকে আরম্ভ করে মধু সংগ্রহ পর্যন্ত অগণিত কাজ এদের করতে হয়। প্রতিদিন একটা মৌমাছি নিজের শরীরের ওজনের প্রায় পাঁচশো গুণ মধু সংগ্রহ করে হাজার হাজার ফুল থেকে। মাত্র এক চা-চামচ পরিমাণ মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছিকে প্রায় দু' হাজার সতেজ ফুলের সন্ধান করতে হয়। আর আধ কেজি মধু সংগ্রহের জন্যে তাকে পরিক্রমা করতে হয় আশী হাজার কিলোমিটার পথ, যা কিনা দু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার সমান। মৌমাছি কিন্তু ফুল থেকে সরাসরি মধু আনে না। আসলে এরা ফুল থেকে রসটা (যা মধু নয়) আহরণ করে এদের উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'মধুথলি'র মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে এই রস নানা উৎসেচকের (enzyme) দ্বারা মধুতে পরিণত হয়। পরে তা উগরে ভবিষ্যতের খাদ্য হিসেবে মৌচাকে জমিয়ে রাখে।

মৌমাছির কোন শ্রবণেন্দ্রিয় নেই, কিন্তু 'শ্রবণশক্তি' আছে। দেখা গেছে, কোন অপরিচিত বা শত্রুভাবাপন্ন মৌমাছি যদি মৌচাকে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তবে পাহারাদার মৌমাছিরা ডানা কাঁপিয়ে বিপদসূলক শব্দ করে। মৌচাকের ভেতরের অন্য মৌমাছিরা তখন সতর্ক হয় এবং আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়। সম্ভবত এই শব্দের কম্পন ধরা পড়ে এদের পায়ের আবরণে। এখন কথা হচ্ছে, সব মৌমাছি তো একই রকম দেখতে, তা হলে মৌচাকের পাহারাদার মৌমাছিরা কিভাবে ভিন্-মৌচাকবাসী বা অপরিচিত মৌমাছিদের চিনতে পারে? প্রত্যেক মৌচাকের রানী মৌমাছি নিজের মুখের গ্রন্থি থেকে এক বিশেষ গন্ধযুক্ত রস বের করে অন্যান্য মৌমাছিদের মুখে মাখিয়ে দেয়। ফলে সেই মৌচাকের প্রত্যেকটি মৌমাছি ওই গন্ধের সঙ্গে পরিচিত থাকে। এখন পাহারাদার মৌমাছিরা মৌচাকে প্রবেশ পথে প্রত্যেক মৌমাছিকে শুঁড় দ্বারা সনাক্তকরণের পর প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়, অপরপক্ষে অপরিচিত মৌমাছিকে তাড়িয়ে দেয়। অতএব প্রত্যেক মৌচাকের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে যা অন্য মৌচাকের গন্ধ থেকে আলাদা।

এরা নিজেদের গৃহকে এয়ার-কন্‌ডিশণ্ড করার ব্যবস্থা করে থাকে। মৌচাকের ভেতরের তাপমাত্রা সাধারণত 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা সব বাইরে বেরিয়ে এসে কুঠুরীগুলোর উপর ডানা দিয়ে দ্রুত বাতাস করতে আরম্ভ করে। কিছু মৌমাছি আবার মুখে করে জল এনে কুঠুরীগুলোর উপর ছড়িয়ে দেয়। শীতকালে সকলে কুঠুরীর উপর জড়ো হয়ে ছোটাছুটি করে, পায়ে পা ঘষে শরীরের তাপ বাড়িয়ে মৌচাকের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। মৌমাছিরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে খুব সহজভাবে ভাব আদান-প্রদান করতে পারে। কোন মৌমাছি নতুন খাদ্যের সন্ধান পাওয়ার পর তার মৌচাকের সাথীদের খাদ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি, দূরত্ব, দিক প্রভৃতি বিশদ বিবরণ বোঝায় মৌচাকের সামনে নানানভাবে নিজের দেহপ্রান্তের আন্দোলন এবং নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে।

মৌচাকে সাধারণত তিন ধরনের মৌমাছি বাস করে। একটি রানী মৌমাছি, কয়েক শ' পুরুষ মৌমাছি এবং কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার কর্মী (স্ত্রী) মৌমাছি। এতক্ষণ

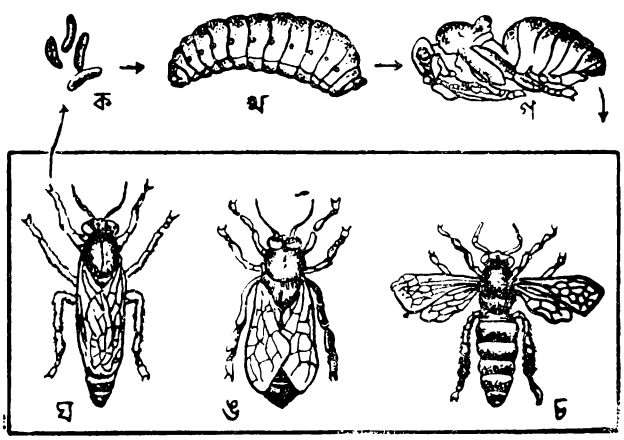

ক, খ, গ মৌমাছির জীবনচক্র ; ঘ রাণী ; ঙ পুরুষ ; চ কর্মী মৌমাছি

যার কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করা গেল সে হলো এই কর্মী মৌমাছি। পুরুষ মৌমাছিরা শুধু রানী মৌমাছির মিলন সঙ্গী এবং এরা বেজায় কুড়ে। নিজের খাবারটুকু মুখে তুলে খায় না। সারাক্ষণ মৌচাকে চুপচাপ বসে কাটায়। রানী মৌমাছির একমাত্র কাজ হলো ডিম পেড়ে বংশ বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া আর কোন কাজ সে করে না। রানী মৌমাছি সাধারণত জীবনে দু'একবার পুরুষ মৌমাছিদের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মিলনের পর রানী তার সব কটা মিলনসঙ্গীকে মেরে ফেলে! রানী মৌমাছি আবার ইচ্ছে অনুসারে নিষিক্ত এবং অনিষিক্ত ডিম প্রদান করতে সক্ষম। নিষিক্ত ডিম থেকে রানী ও কর্মী মৌমাছির বাচ্চা জন্মায় অর্থাৎ স্ত্রী মৌমাছি জন্মায় আর অনিষিক্ত ডিম থেকে জন্মায় পুরুষ মৌমাছির বাচ্চা। সুতরাং রানী মৌমাছি তার ইচ্ছেমতো স্ত্রী বা পুরুষ মৌমাছির জন্ম দিতে পারে। সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। নিষিক্ত ডিম থেকেই একসঙ্গে বেরোয় রানী ও কর্মী মৌমাছির বাচ্চা, কিন্তু পরে ওদের দৈহিক আকৃতি এক রকম হয় না। কর্মীর চেয়ে রানী অনেক গুণে বড় এবং মোটাসোটা হয়ে থাকে। কারন বাচ্চা রানী মৌমাছিদের খাওয়ানো হয় উৎকৃষ্ট 'রাজকীয় জেলি' যা কর্মী মৌমাছিরা নিজেদের দেহ থেকে তৈরী করে আর কর্মী ও পুরুষ বাচ্চারা খায় সাধারণ তরল মধু এবং ফুলের পরাগ। এই সব খাদ্যের আয়োজন এবং বাচ্চাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে কর্মী মৌমাছিরা, যারা প্রায় ক্রীতদাসের মতো সারাটা জীবনই খেটে মরে মৌমাছি সমাজে। এমন কি, এই কর্মীরা বড় পুরুষ মৌমাছিদের এবং রানীকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার মুখে তুলে খাইয়েও দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্ত্রীরূপে জন্মেও এই কর্মী মৌমাছিরা কোনদিন মাতৃত্বের স্বাদ পায় না।

30/10, সেলিমপুর রোড, কলকাতা—31

● ছবির মজা / প্রনব ঘোড়

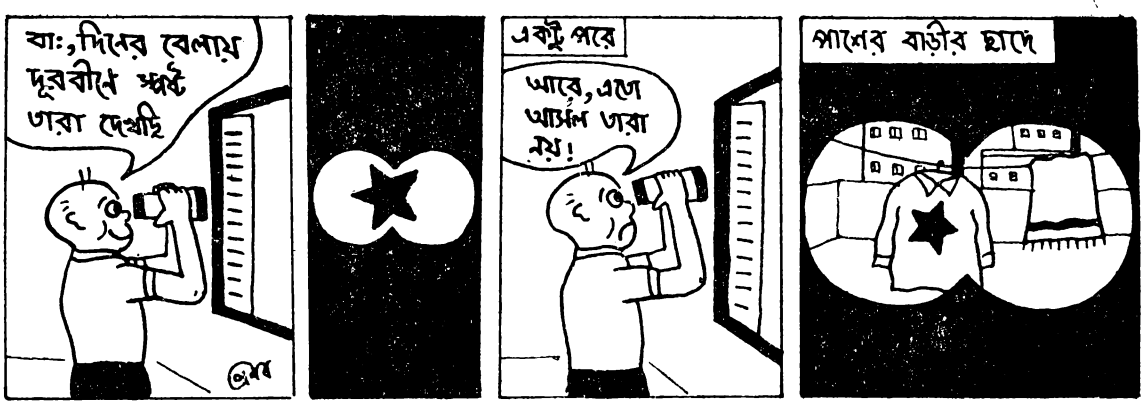

গন্ধ ও ঘ্রাণ

রণতোষ চক্রবর্তী

মন্দিরে মনমাতানো ধূপের গন্ধ, বাগানে ফুলের সুগন্ধ, আবার আবর্জনার ধারে দুর্গন্ধ কে না পেয়েছে? ভালো গন্ধ বার বার শুঁকে যেমন বেশি করে উপভোগ করি, তেমনি আবার দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতে নাকে রুমাল চেপে রাখি। নাক দিয়ে আমরা গন্ধ পেয়ে থাকি—এ কথা সবার জানা। তবে সব কিছুর গন্ধ আমরা পাই না। ইঁট, পাথর, লোহার টুকরো—এদের যেমন কোন গন্ধ নেই। আসলে যে সব পদার্থ উদ্বায়ী অবস্থায় বাতাসে ভাসে কেবলমাত্র সেরকম বস্তুর গন্ধই পাওয়া সম্ভব। যদিও প্রকৃত গন্ধ বুঝতে হলে সেই উদ্বায়ী বাতাস নাকের অন্তঃপুরের বিশেষ এলাকা অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম বা ঘ্রাণ-আবরণীর সংস্পর্শে আসতে হয় এবং নাকের এই বিশেষ এলাকা থেকে ঘ্রাণ-সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছলে তবেই সত্যিকারের গন্ধ অনুভূত হয়।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কাজের জন্যে বাইরের বাতাস আমরা নিয়ে থাকি। এই বাতাস সাধারণত নাক দিয়েই দেহে ঢোকে এবং গন্ধ পেতে হলে বাতাস নাক দিয়েই নিতে হবে, মুখ দিয়ে নিলে গন্ধ মিলবে না। আমাদের দুটি নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে বাতাসকে বেশ পেঁচানো গলি পথে যেতে হয়। এই পথের কিছু এলাকার গঠন একটু বৈচিত্র্যময়। একেই বলে অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম। আসলে এখানে লম্বাটে ধরনের প্রচুর 'বাইপোলার স্নায়ুকোষ' নামে বিশেষ কোষ রয়েছে, যারা বাতাসের যে কোন উদ্বায়ী পদার্থের দ্বারা উত্তেজিত হতে পারে। নাকের ভিতরের এই অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম এলাকা খুব ছোট নয়, দুটো নাকের একত্রে প্রায় পাঁচশ' বর্গ মি মি জায়গা জুড়ে এই ঘ্রাণ-আবরণী। কাজেই ঘ্রাণের গ্রাহক বলতে কিন্তু এই বাইপোলার স্নায়ুকোষকেই বোঝায় এবং উদ্বায়ী পদার্থের দ্বারা উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা নির্দিষ্ট স্নায়ুপথে নাকের প্রকোষ্ঠের ঠিক উপরে স্নায়ুতন্ত্রের হেড অফিস মস্তিষ্কে পৌঁছয়। যে কোন বড় অফিসে কাজের সুবিধার জন্যে যেমন নানা বিভাগ থাকে, আমাদের মস্তিষ্কেও বিভিন্ন খবরের জন্যে নানা কেন্দ্র রয়েছে। কাজেই গন্ধের জন্যে মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট ঘ্রাণ-কেন্দ্র রয়েছে। স্নায়ুপথে গন্ধের উত্তেজনা-সংকেত এই ঘ্রাণ-কেন্দ্রে পৌঁছলে একে বিশ্লেষণ করা হয়, অর্থাৎ গন্ধের প্রকৃতি ভাল কি মন্দ, একে গ্রহণ না বর্জন, গন্ধের উৎস, এমন কি এই গন্ধ কবে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল ইত্যাদি পুরনো 'ফাইল ঘেঁটে' বার করা হয়। স্বভাবতই এ কাজ ঘ্রাণ-কেন্দ্র আশেপাশের অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসাজসেই করে থাকে।

বলা বাহুল্য, মানুষ অন্য সব প্রাণী থেকে উন্নত। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘ্রাণগ্রহণে অর্থাৎ ঘ্রাণ-শক্তিতে আমাদের অতি তুচ্ছ পিঁপড়ের কাছেও হার স্বীকার করতে হয়। পিঁপড়ের মতো অনেক পতঙ্গ শ্রেণীর ঘ্রাণ গ্রহণশক্তি আমাদের কাছে গল্পের মতো। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, স্ত্রী-মথের উপস্থিতি পুরুষ-মথ প্রায় এক মাইল দূর থেকেও বুঝতে পারে এবং এটি ওদের প্রবল ঘ্রাণশক্তির দ্বারাই সম্ভব। এ ছাড়া কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরও এই ক্ষমতা আমাদের থেকে অনেক গুণ বেশি। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি বেশি বলেই অপরাধীদের ধরবার ব্যাপারে অনেক সময় বিশেষভাবে শিক্ষিত কুকুরদের কাজে লাগাবার কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকবে।

তোমাদের জানা আছে, খাবারের স্বাদের জন্যে আমাদের জিহ্বা দায়ী। সম্পূর্ণ স্বাদ পেতে হলে কিন্তু গন্ধেরও প্রয়োজন। সর্দি হলে দেখে থাকবে খাবার স্বাদও যেন কমে যায়। এর কারণ অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম এলাকার উপর সর্দির মিউকাস জমে থাকে বলেই উদ্বায়ী পদার্থ সরাসরি স্নায়ুকোষের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

আমাদের বেলায় খাবারের স্বাদ, ফুলের বা আতরের সুগন্ধ আবার পচা-দুর্গন্ধ সবই গন্ধ দ্বারা পেয়ে থাকি। তবে গন্ধ আমাদের প্রশ্বাস বায়ুর ভালোমন্দ বিচার করে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক তা জানিয়ে দেয়। প্রাণীদের বেলায় গন্ধের প্রয়োজন অনেক বেশি। খাবার খোঁজা, শত্রু বা স্বজাতির উপস্থিতি এরা একমাত্র গন্ধ দিয়েই বুঝতে পারে। এই সব গুণাবলী এদের বেঁচে থাকার জন্যে খুবই প্রয়োজন বলেই এদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

পিতার প্রতি সন্তানের এরকম অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে পাওনাদারেরা অভিভূত হল

আমরা আর টাকা চাই না। যা দিয়েছেন তাতেই সব শোধ হয়ে গেছে।

তা হয় না। কোন ঋণই থাকা উচিত নয়। ক্রমে সবই শোধ করে দেব।

একে একে পিতার সব ঋণই পরিশোধ করে দিলেন জগদীশচন্দ্র। এর পর এক বছর যেতেই পিতা ভগবানচন্দ্র দেহত্যাগ করলেন। দু'বছরের মধ্যে মা-ও এ পৃথিবীর মায়া ছাড়লেন। জগদীশচন্দ্র শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে গেলেন।

এখন থেকে জগদীশচন্দ্রের জীবন ধারার গতি পথ ভিন্ন খাতে অগ্রসর হল। সেই পথের প্রেরণা দাত্রীরূপে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী অবলা দেবী

অধ্যাপনার সঙ্গে শুরু হল তাঁর বিজ্ঞান সাধনা। বিদ্যুৎতরঙ্গের গতি প্রকৃতি নিয়ে চলল তাঁর গবেষণা।

আবিষ্কার করলেন বৈদ্যুতিক আলোক বিকিরণ সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব।

বিদ্যুৎ তরঙ্গের আবিষ্কার কর্তা হেনরীচ হার্জ-এর অসম্পূর্ণ কাজে জগদীশচন্দ্রের হাতে পরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি এটা নতুন ভাবে তৈরী যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করে দেখালেন যে— হার্জ যা বলেছিলেন অর্থাৎ দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক উভয়ের ধর্মই এক

লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিও পরাধীন ভারতের এই অখ্যাত বৈজ্ঞানিককে তার প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হল না

এই দ্যাখ অবলা, লণ্ডন সোসাইটি আমাকে ডক্টর অব সায়ান্স উপাধিতে ভূষিত করেছে। এবং তারা আমার জন্যে একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আমি জানতাম তুমি পারবে, আর এই তোমার যাত্রা হল শুরু।

সহজ কথায় রসায়ন ঃ [চার]

তিনটি সুপরিচিত গ্যাস

অমরনাথ রায়

বাতাসের চেয়ে হালকা, ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন একটা গ্যাস আছে। গ্যাসটা জলে অতিমাত্রায় দ্রাব্য বলে বাতাসের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সেটিকে গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। ঐ গ্যাসের ক্লোরাইড যৌগ এক ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে তিনভাগ ওজনের মিশ্রণটাকে উত্তপ্ত করলেই ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ঐ গ্যাসটা বেরুতে থাকে। গ্যাসটা ক্ষারীয় বলে তার সংস্পর্শে লাল লিটমাস কাগজ নীল হয়ে যায়।

—এবারে বল দেখি, গ্যাসটার নাম কি ?

—হ্যাঁ, ওটা অ্যামোনিয়া গ্যাস।

পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত, বাতাসের চেয়ে ভারী, বর্ণহীন একটা বিষাক্ত গ্যাস আছে। ঐ গ্যাসটা ঠাণ্ডা জলে দ্রাব্য, কিন্তু গরম জলে অদ্রাব্য। গ্যাসটাকে তাই বাতাসের ঊর্ধ্ব অপসারণ অথবা গরম জলের নিম্নাপসারণ দ্বারা জারে সংগ্রহ করা হয়। লোহার একটা সালফাইড্ যৌগের সঙ্গে সাধারণ উষ্ণতায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালেই ঐ গ্যাসটা উৎপন্ন হয়। ঠাণ্ডা জলে এই গ্যাসটাকে দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণে নীল লিটমাস দিলে তা সামান্য লাল হয়ে যায়। তার মানে, ঠাণ্ডা জলে এই গ্যাসটার দ্রবণ সামান্য অম্লধর্মী।

—এবারে বল দেখি, এই গ্যাসটার নাম কি ?

—হ্যাঁ, এটা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস।

আর একটা গ্যাসের কথা বলি। এ গ্যাসটার না আছে রং, না আছে গন্ধ। গ্যাসটা দাহ্যও নয় আবার অন্য পদার্থের দহনের সহায়কও নয়। এ গ্যাসটা বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ ভারী এবং সামান্য অম্লস্বাদযুক্ত। সাধারণ উষ্ণতায় মার্বেল পাথরের সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশালেই এই গ্যাসটা উৎপন্ন হয়। বাতাসের ঊর্ধ্ব অপসারণ দ্বারা গ্যাসটাকে গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। 'শুকনো বরফ' বা 'ড্রাই আইস' এই গ্যাস থেকেই তৈরী হয়। 'সোডা ওয়াটার' তৈরী করতে হলে এ গ্যাসটা অপরিহার্য।

—এখন বল দেখি, এটা কোন্ গ্যাস ?

উত্তর হবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস।

এই তিনটি গ্যাসের কথাই তোমরা ভৌত বিজ্ঞানের বইতে পড়েছ। জেনেছ এদের প্রত্যেকটির প্রস্তুতি ও সংগ্রহপ্রণালী, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এবং ব্যবহার। বই পড়ে কতটা শিখেছ তা যদি যাচাই করে নিতে চাও তো নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। প্রথমে তুমি নিজে উত্তর ঠিক কর। তারপর এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তর-গুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নাও—তোমার উত্তর মিলছে কিনা। কতটা তুমি শিখেছ।

1. বাতাস্থিত জল (সোডা ওয়াটার লেমোনেড প্রভৃতি) প্রস্তুত করতে নিচের কোন্ গ্যাসটির প্রয়োজন হয় ?

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) হাইড্রোজেন সালফাইড।

2. লেড নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে কোন্ গ্যাসটি পরিচালনা করলে কালো রঙের একটা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়।

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) হাইড্রোজেন সালফাইড।

3. ফোয়ারা বা ঝর্ণা পরীক্ষা করা যায় কোন্ গ্যাসটির সাহায্যে ?

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) হাইড্রোজেন সালফাইড।

4. নিচের কোন্ গ্যাসটি আগুন নেভাতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) অ্যামোনিয়া।

5. নিচের কোন্ গ্যাসটি হলুদ রঙের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণকে বিজারিত করে বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত করে ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) অ্যামোনিয়া (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

6. স্বচ্ছ চুন জলের মধ্যে নিচের কোন্ গ্যাসটিকে পরিচালনা করলে স্বচ্ছ চুন-জল ঘোলা হয়ে যায় ?

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) হাইড্রোজেন সালফাইড (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

7. সোডিয়াম অ্যামাইড বা 'সোডামাইড' তৈরি করতে হলে নিচের কোন্ গ্যাসটির প্রয়োজন হয় ?

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) হাইড্রোজেন সালফাইড।

8. নিচের কোন্ গ্যাসটি জমির একটি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুতির জন্যে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) অ্যামোনিয়া।

9. নিচের কোন্ গ্যাসটিকে কিপ যন্ত্রে প্রস্তুত করা যায় না ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) অ্যামোনিয়া (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

10. রূপার জিনিস নিচের কোন্ গ্যাসটির সংস্পর্শে এলে কালো হয়ে যায় ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) অ্যামোনিয়া।

11. 'নেসলার দ্রবণ' নিচের কোন্ গ্যাসটির সংস্পর্শে এলে তামাটে হয়ে যায় ?

(ক) অ্যামোনিয়া (খ) হাইড্রোজেন সালফাইড (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

12. নিচের কোন্ দু'টি গ্যাসের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় (বিশেষ বিশেষ শর্তে) 'ইউরিয়া' নামক উৎকৃষ্ট সার উৎপন্ন হয় ?

(ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (খ) হাইড্রোজেন সালফাইড (গ) অ্যামোনিয়া।

13. নিচের কোন্ গ্যাসটিকে চুণ-স্তম্ভের ভিতর দিয়ে পরিচালনা করে শুষ্ক করা হয় ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) অ্যামোনিয়া (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

14. নিচের কোন্ গ্যাসটি কষ্টিক সোডা দ্রবণে শোষিত হয়ে কার্বনেট যৌগ গঠন করে ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) অ্যামোনিয়া (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

15. গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে নিচের কোন্ গ্যাসটির বিক্রিয়ায় বাদামী রঙের একটি গ্যাস উৎপন্ন হয় ?

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (গ) অ্যামোনিয়া।

16. নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য ?

(ক) অক্সিজেনে অ্যামোনিয়ার দহনে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

(খ) অক্সিজেনে অ্যামোনিয়ার দহনে নাইট্রিক অক্সাইড ও স্টীম উৎপন্ন হয়।

(গ) অক্সিজেনে অ্যামোনিয়ার দহনে নাইট্রোজেন ও স্টীম উৎপন্ন হয়।

17. অ্যামোনিয়ার কোন্ যৌগটি বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) নাইট্রাইট (খ) নাইট্রেট (গ) সালফেট।

18. অ্যামোনিয়ার নিম্নোক্ত যৌগগুলির মধ্যে কোন্টিকে এককভাবে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় না ?

(ক) নাইট্রেট (খ) কার্বনেট (গ) ক্লোরাইড।

19. নিচের বিক্রিয়াগুলির মধ্যে কোন্টি কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতির পক্ষে উপযুক্ত নয় ?

(ক) $CaCO_3 + H_2SO_4$

(খ) $Na_2CO_3 + HCl$

(গ) $CaCO_3 + HNO_3$

20. হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস সম্পর্কে কোন্ উক্তিটি সত্য ?

(ক) গ্যাসটি জলে দ্রাব্য এবং প্রশম লিটমাস দ্রবণকে নীল করে ?

(খ) আর্দ্র সালফার ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে গ্যাসটি জারক দ্রব্যরূপে ক্রিয়া করে।

(গ) গ্যাসটির জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে।

21. হাইড্রোজেন সালফাইড এবং সালফার ডাই-অক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে হলে মিশ্রণটি কেমন হওয়া দরকার ?

(ক) ঐ গ্যাস-মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা দরকার।

(খ) আর্দ্র হওয়া দরকার।

(গ) শুষ্ক হওয়া দরকার।

22. নিচের কোন্ উক্তিগুলি হাইড্রোজেন সালফাইডের ক্ষেত্রে সত্য ?

(ক) গ্যাসটিতে তার সম আয়তন হাইড্রোজেন আছে।

(খ) গ্যাসটিতে তার সম ওজনের সালফার আছে।

(গ) দহনের সময় গ্যাসটি সম ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়।

23. ক্লোরিন জল, ব্রোমিন জল এবং আয়োডিন মিশ্রিত জলের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পৃথক পৃথকভাবে চালনা করা হলে একটি সাধারণ মৌল উৎপন্ন হয়। সেই মৌলটির নাম কি ?

24. সালোক সংশ্লেষণের জন্যে উদ্ভিদের কোন্ গ্যাস প্রয়োজন হয় ?

25. শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

উত্তপ্ত কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করলে কিউপ্রিক অক্সাইড -- হয়ে লাল রঙের ধাতব কপার উৎপন্ন করে।

উত্তর ঃ

(1) খ, (2) গ, (3) ক, (4) খ, (5) ক, (6) গ, (7) ক, (8) গ, (9) খ, (10) ক, (11) ক, (12) ক এবং গ, (13) খ, (14) গ, (15) ক, (16) গ, (17) খ, (18) ক, (19) ক, (20) গ, (21) খ, (22) ক, (23) সালফার, (24) কার্বন ডাই-অকসাইড, (25) বিজারিত।

এক টুকরো পাথর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

মেসোমশাই-এর চিঠিটা পেয়ে লাফিয়ে উঠলো দীপ। মেসোমশাই চিঠিটা লিখেছেন উড়িষ্যার সম্বলপুর থেকে। চিঠিটা ছিল এই রকম ঃ

স্নেহের দীপ,

সম্বলপুরের রেষ্ট হাউস থেকে তোমাকে চিঠিটা লিখছি। আজ কদিন হলো এখানে এসেছি। যদি কদিন বেড়িয়ে যেতে চাও তা হলে কালকেই রাতের সম্বলপুর আসার গাড়িতে রওনা হতে পার। অভ্রকেও আনতে ভুলো না। অন্য কিছু ভেবে বোসো না যেন, এ নিছক ভ্রমণের ব্যাপার ছাড়া কিছু না। পরশু সকালে সম্বলপুর ষ্টেশনেই আমি গাড়ি নিয়ে থাকব। আশীর্বাদ জেনো। ইতি

মেসোমশাই

দীপ, চিঠিটা আরো বার দুয়েক পড়ে ফেললো। পড়ার পরেও ও কিন্তু সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করতে পারলো না। সন্দেহজনক মানে, বাড়ির কেউ যাতে কোনরকম সন্দেহ না করে।

আসলে ব্যাপারটা হলো, দীপের মেসোমশাই যখনই ওদের ডেকে পাঠান, কোথাও না কোথাও একটু অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারই লুকিয়ে থাকবে তার মধ্যে। অভ্র আর দীপ দুই সমান বয়সী বন্ধু। আর দীপের মেসোমশাই শেষ পর্যন্ত অভ্ররও মেসোমশাই হয়ে উঠেছেন।

দীপের এই মেসোমশাই অদ্ভুত মানুষ। দারুন বড় শিকারী আর অসম্ভব রকম সাহসী। প্রায় পৌনে ছ ফিট দেহ যেন পেটা লোহায় গড়া। থাকেন রাঁচিতে—মস্ত ব্যবসাও আছে। কিন্তু কোন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে সব কিছু ফেলেরেখেই সেখানে ছুটে যান। তাঁর এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা দীপ আর অভ্রকেও পেয়ে বসেছে। ওদের সঙ্গে মেসোমশাইয়ের সম্পর্ক খুবই স্নেহের। অভ্র আর দীপের মধ্যেও বন্ধুত্ব অতি নিবিড়। দুজনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে একই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছে। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে দুজনেরই রক্তে দোলা লাগে। বাড়ির সকলে তাই ওই মেসোমশাইকে বেশ একটু সন্দেহের চোখেই দেখে। মেসোমশাইএর স্ত্রী, দীপের রাঙামাসীমা তো বলেই গেলেন মেসোমশাইকে 'তুমিই ওদের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছ'।

অভ্র আর দীপের বন্ধুত্ব দেখে সবাই ওদের একনামে ডাকে অভ্রদীপ বলে। কেউ কেউ আবার ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না—বলে মানিকজোড়। গায়ে মাখে না অভ্র আর দীপ। আসলে ওরা যেন আলাদা ধাতুতেই গড়া, এসব তুচ্ছ ব্যাপার ওদের চোখেই পড়তে চায় না।

উনিশ বছরের জীবনে ওরা বেশ কিছু কঠিন অবস্থারও মুখোমুখি হয়েছে। দারুন সব অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারও ওদের জীবনে ঘটে গেছে—আর প্রতিবারই ওদের সঙ্গী থেকেছেন মেসোমশাই। সুন্দর একটা দলই যেন ওরা গড়ে তুলেছে। কোন কিছু রহস্যময় ব্যাপার চোখে পড়লেই মেসোমশাই তাই ওদের না জানিয়ে পারেন না। ওদের মতামতকে শ্রদ্ধা করেন তিনি।

ব্যাপারটা ওদেরই মতো সকলেই জেনে ফেলেছে বলেই বিপদ। মেসোমশাইএর চিঠি এলেই তাই দীপের বাড়ি তো বটেই, অভ্রের বাড়ির সকলেই ভাবনায় পড়ে যায়। গতবার ওরা যখন রাঁচিতে বেড়াতে যায়, 'নীল মাকড়সা' বলে একটা ব্যাপারে ওদের নামও দারুন ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এমন কি বিদেশের কোন কোন কাগজেও এ নিয়ে লেখা-লিখি হয়। বলতে গেলে ওরা তিনজনই রাতারাতি একেবারে বিখ্যাত।

আজকের চিঠিটা দীপকেও একটু যে ভাবনায় ফেলে নি তাও নয়। একটু সন্দেহ ওরও মনে জাগছিল। মেসোমশাই রাঁচি ছেড়ে হঠাৎ সম্বলপুরে গেলেন কেন? আর আচমকা ওদেরই বা ডাকতে গেলেন কেন?

ভেবে কোন কূলকিনারা না পেয়ে ও ছুটলো এবার বন্ধু অভ্রর বাড়ি। অবশ্য তেমন দূরে থাকে না। দীপের মতো ওরাও থাকে ভবানীপুরেই।

সকালবেলাতেই দীপকে দেখে অভ্র বলে উঠলো: 'কি ব্যাপার রে, দীপ?'

দীপ কোন কথা না বলে মেসোমশাইর চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলো। চিঠিটা পড়ে ফেলেই অভ্র বললো: 'যাচ্ছিস তা হলে?'

'যেতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো?'

অভ্র কি যেন একটা ভেবে নিয়েই ভিতরে ছুটলো। তারপর মিনিট কয়েক বাদে হাসি মুখে একটা ইংরেজি কাগজ নিয়ে ফিরে এলো।

'এই খবরটা একটু দেখে নে: ও বললো, 'গত রবিবারের কাগজ এটা।'

কাগজটা হাতে নিয়ে অভ্রর দেখানো একটা ছোট্ট খবর পড়ে ফেললো দীপ। তাতে যা রয়েছে সেটা হলো: গত কয়েকদিন ধরে কালাহাণ্ডির জঙ্গলে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার ঘটছে। সেখানে নাকি ভয়ঙ্কর এক দানবকে দেখা গেছে রাত আর দিন দুসময়েই। স্থানীয় কিছু মানুষ জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে ভয়ঙ্কর সেই দানবের মুখোমুখি হয়েছে। দানবের আকার প্রায় ছ' ফিটের মত, চোখে আগুন। লোকেরা দূর থেকেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে, অবশ্য দানব তাদের তাড়া করে নি, সে জঙ্গলের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছিল। লোকে ভয়ে জঙ্গলে ঢোকাই বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্যের কথা পুলিশ জঙ্গল চষে ফেলেও কিছু দেখতে পায় নি, তাই ব্যাপারটা গাঁজাখুরি বলেই ধরে নিয়েছে।

'কিন্তু আমাদের মেসোমশাই তা ধরেন নি'—হাসিমুখে বলে উঠলো অভ্র।

'ঠিক বলেছিস। মেসোমশাই এই দানবের ব্যাপারটা দেখার জন্যেই সম্বলপুরে গিয়েছেন আর আমাদেরও তাই বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বাড়ির অনুমতি মেলার পর অভ্র আর দীপ যথাসময়েই সম্বলপুরের ট্রেনে চেপে পরের দিন ভোরেই সম্বলপুর পৌঁছে গেল।

স্টেশনে নেমে দাঁড়াতেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন মেসোমশাই।

'এই যে এসে গেছ তোমরা। আমি জানতাম ঠিক আসবে', তিনি বললেন, 'চলো, জিপে যেতে যেতেই কথা বলবো।'

সকলে স্টেশন চত্বর ছেড়ে বাইরে এসে জিপে উঠতেই সেটা ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'সম্বলপুর তো আগে আসো নি তোমরা, তাই চারদিক একটু দেখে নাও। আমাদের রেস্ট হাউস শহরের প্রায় মাঝামাঝিই। এ শহরটা নেহাৎ ছোট নয়, বড় রেলওয়ে জংশনও,' মেসোমশাই বললেন।

'কালাহাণ্ডির দানবের কথাটাই আগে বলুন, মেসোমশাই', অভ্র বলে উঠলো।

হোঃ হোঃ করে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন মেসোমশাই।

'নাঃ, তোমাদের কাছে প্রত্যেকবারই হেরে যাচ্ছি। এবারে ভাবলাম তোমাদের একদম সারপ্রাইজ করে দেব, তাও আর হলো না। কিন্তু ব্যাপারটা ধরলে কেমন করে?'

'অভ্রই আবিষ্কার করেছে গত রবিবারের কাগজে খবরটা দেখে,' দীপ বললো।

'কিন্তু, মেসোমশাই ব্যাপারটা কি সত্যি?' দীপ জানতে চাইলো।

'সত্যি। আর তার জন্যেই নিজে যাচাই করতে এসেছি।

'কিন্তু কিভাবে করবেন? আর বিংশ শতাব্দীতে সত্যিই দানব আছে?' অভ্র প্রশ্ন করলো।

'আমরা নিজেরাই সেটা দেখতে চাই। সন্দেহ একটা আমি করেছি, কিন্তু সেটা তোমাদের আগে জানাতে চাই না। আমরা কাল সকালে জঙ্গলের গভীরে ঢুকবো.....।'

'তারপর?'

'সরকারী অনুমতি আর অন্য ব্যবস্থাও থাকবে। ওখানে একটা বড় গাছে আমরা আশ্রয় নেব। সঙ্গে থাকবে ট্রান্স-মিটার আর অস্ত্রও। তারপর দেখা যাক—।'

ওরা ততক্ষণে রেস্ট হাউসে এসে পড়েছিল। বেসরকারী একটা রেস্ট হাউস। চমৎকার দুখানা ঘর।

ব্রেকফাস্ট সেরে মেসোমশাই এবার একটু বাইরে চলে গেলেন, ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে আসবেন জানিয়ে।

মেসোমশাই ফিরে আসার পর উড়িষ্যার চমৎকার চালের ভাত আর মাছের ঝোল দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলো সকলে। বিকেলের দিকে জনৈক পুলিশ অফিসার এলেন মেসোমশাইর কাছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ

আলোচনা সেরে চলেও গেলেন।

মেসোমশাই এরপর তাঁর রাইফেলটা সাফ করতে বসলেন।

বেশ ঠাণ্ডা ভাবই পড়েছিল রাতের দিকে। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ উত্তেজনা নিয়েই অভ্র আর দীপ শুয়ে পড়লো।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ সবাই তৈরি হয়ে নিলো। জিপও তৈরি। মেসোমশাই-এর সব সময়ের সঙ্গী বাহাদুর ছিল। সে রাইফেল আর একটা বড় বাক্স জিপে তুললো।

জিপ ছাড়লো সওয়া আটটায়। সঙ্গে রইলো আরও একটা গাড়ি। অভ্র আর দীপ দেখেই বুঝলো পুলিশের গাড়ি। তাতে বেশ কজন পুলিশও ছিল, সকলেই সশস্ত্র।

ব্যাপারটা বুঝলো না অভ্র আর দীপ। পুলিশ কেন? তা হলে কি কোন অপরাধী ধরতে যাওয়া হচ্ছে? পৌঁছে গেল। এরপরেই শুরু হয়েছে কালাহাণ্ডির জঙ্গল। বেশ গভীর জঙ্গল, বন্য প্রাণীও কম নেই।

জিপ আর পুলিশের গাড়ি থামতেই ওরা সবাই নেমে পড়লো।

'আমরা এখান থেকে পায়ে হেঁটে ঢুকবো।' মেসোমশাই কথাটা বলেই পুলিশের দলটার সঙ্গে কি কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

পুলিশ পাঁচজন ওখানেই রয়ে গেল আর মেসোমশাই অভ্র আর দীপকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। বাহাদুরও রইলো জিপে।

ভয় পাচ্ছ না তো?' মেসোমশাই বললেন।

'একটুও না। কিন্তু মেসোমশাই, আপনি কি কোন লড়াই আশা করছেন?' দীপ প্রশ্ন করলো।

'সত্যি কথা বললে, না। তবে সাবধানের মার নেই।'

প্রায় মিনিট কুড়ি চলার পর মেসোমশাই একটা শাল গাছের কাছে এসে থামলেন। জঙ্গল ততক্ষণে বেশ গভীরই হয়েছে। কোন বন্য জন্তু ওদের চোখে পড়েনি ওদের, একমাত্র খরগোস ছাড়া। চারিদিকে খালি ওই শালবন। কোন কোন জায়গায় পাতা ভেদ করে সূর্যের আলোও মাটিতে আসতে পারছে না। কেমন একটু শির-শির করা হাওয়া।

মেসোমশাইএর হাতে রাইফেল আর একটা ছোট ব্যাগ। অভ্র আর দীপ বুঝলো ওটা ক্ষুদে ট্রান্সমিটার।

'এবার এই গাছটাতে উঠতে হবে। গাছটা আমিই আগে বেছে রেখে গিয়েছিলাম—এখানে উপর থেকে বহুদূর দৃষ্টি মেলা যায়। কাঠুরেরা এই অবধি এসেছিল। এখান থেকেই সব লক্ষ্য করবো।'

একে একে ওরা সকলেই গাছের বেশ মাঝামাঝি অংশে ডালপালার উপর উঠে বসলো। গাছটা এমনই যে উঠতে সেরকম কষ্ট হলো না।

গাছে উঠে সামনে তাকাতেই ওরা মানে অভ্র ও দীপ বেশ অবাকই হয়ে গেল। দশ গজের মতো তফাতে চমৎকার কিছু ফাঁকা অংশই রয়েছে, আর কাছেই একটা ছোট টিলার মতোই অংশ। ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না।

অবশ্য তার জন্যে ওদের অপেক্ষাও করতে হলো না। ওরা পা ঝুলিয়ে নিজেদের নিরাপদে রেখে বসতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্যই সকলের সামনে জেগে উঠলো।

একটা অদ্ভুত আকারের প্রাণীকে ফাঁকা জায়গায় টিলার পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো ওরা।

'একি···এ যে একটা রোবট!' অভ্র আর দীপ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো।

সত্যিই তাই, বিরাট একটা কিম্ভূত দর্শন রোবটই হবে। রোবটটা ওদের দিকে ফিরেই যেন দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ানোর পর আবার পিছন ফিরে টিলার পিছনে চলে গেল।

মেসোমশাই ট্রান্সমিটারটা বের করে সম্ভবতঃ ওই জঙ্গলের বাইরে থাকা পুলিশ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাওয়ার মুখেই থেমে গেলেন। কারণ ওই সামনের অংশ থেকে ভেসে এলো পরিষ্কার বাংলা কণ্ঠস্বর ঃ

'পৃথিবীর মানুষ, আমরা আপনাদের দেখেছি। তার আগে হয়তো জানতে চাইবেন আমরা কে? তাই না? বেশ তা হলে শুনুন, আমরা আপনাদের এই পৃথিবীর কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহের অধিবাসী। আমরা বিজ্ঞানে আপনাদের গ্রহ থেকে বহুদূরেই এগিয়ে আছি। আমরা পৃথিবীর যে কোন ভাষাতেই আমাদের কথা শোনাতেও পারি—যন্ত্রই তা সম্ভব করেছে। আমরা যন্ত্রের মাধ্যমেই আপনাদের মনের কথাও জানতে সক্ষম। আমরা জানি আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি।

'কিন্তু সে চেষ্টা করবেন না, অনুরোধ। শুনুন আমরা অস্ত্রবলেও অনেক বেশি উন্নত। আমাদের লেসার রশ্মি মুহূর্তে আপনাদের ছাইয়ে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তা করতে আমরা একটুও আগ্রহী নই। কারণ আমরা মরণযজ্ঞে বিশ্বাস করি না, আপনাদের পৃথিবী এখনও লক্ষ লক্ষ বছর পিছিয়ে আছে এ ব্যাপারে। আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি!

'এবার শুনুন, এই পৃথিবী গ্রহে আমরা কেন এসেছি। সব ব্যাপারে অগ্রসর হলেও একটি ব্যাপারে আমাদের

পৃথিবীর মানুষ, আমরা আপনাদের দেখেছি।

অভাব রয়ে গেছে—তা হলো আমাদের অতি প্রয়োজন ইউরেনিয়াম।'

'হ্যাঁ, ইউরেনিয়াম আমাদের একান্ত প্রয়োজন, আমাদের গ্রহে তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। তাই নানা গ্রহ থেকে সেট আমরা সংগ্রহ করে চলেছি। তবে আপনাদের জানা ইউরেনিয়াম আইসোটোপ 235 নয় এ এক নতুন আইসোটোপ, যার নাম পৃথিবীবাসী শোনে নি। আর সেটাই আছে এই কালাহাণ্ডি নামের আপনাদের জঙ্গলের এলাকায়।'

'আমরা দুঃখিত, সেই ইউরেনিয়াম আমরা সবটাই সংগ্রহ করেছি। আমরা এবার বিদায় নিতে চাই। আপনাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। সমস্ত ইউরেনিয়াম তুলে নেওয়ায় আমরা দুঃখিত, কিন্তু কোন উপায় নেই—এটাই আমাদের জীবন। আপনাদের অনুরোধ, আপনারা চলে যান। আর আমাদের দেখতে পাবেন না। বিদায়।'

প্রায় মোহগ্রস্তের মতোই ওরা তিনজন কথাগুলো শুনে চলেছিল। কথা শেষ হতেও ওদের কানে তার রেশ বেজে চললো।

'চলো, অভ্র আর দীপ, এবার নামি,' মেসোমশাই বলে উঠলেন।

'তা হলে এবার কি হবে, মেসোমশাই?' দীপ প্রশ্ন করলো নেমে আসার পর। 'আপনি কি এইরকমই কিছু ভেবেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে মেসোমশাই?'

'এই পাথরটা দেখে'—মেসোমশাই এক টুকরো ছোট্ট পাথর বের করে দেখালেন। 'কিন্তু কিছুই করবার নেই, আমাদের চলেই যেতে হবে।'

অদ্ভুত উজ্জ্বল, হালকা সবুজ রঙের একটুকরো পাথর একটা ধাতব বাক্সে বসানো।

দীপ হাত দিতে যেতেই বাধা দিলেন মেসোমশাই।

'না, হাত দিও না, দীপ। এটা তেজস্ক্রিয় হতে পারে। এই পাথরটা প্রথম দিনেই খুঁজে পাই। পরীক্ষা করে এইরকম সন্দেহ আমার হয়েছিল, আর আজ তাই প্রমাণও হয়ে গেল। এ পাথর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না—মহামূল্যবান এ পাথর। ওই গ্রহের জীব যারা, তারা বোধ হয় ইচ্ছে করেই এটা দিয়ে গেছে। তবে এটা তো কাছে রাখতে পারব না, এটা সরকারেরই সম্পত্তি। দুঃখিত মনে হলো মেসোমশাইকে।

159/1 B, বকুলবাগান রোড, কলি—25

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

তারকমোহন দাস

তোমাদের পরিবেশের মধ্যে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তা সংগ্রহ করতে হলে, তাদের ঠিকমত সনাক্ত করতে হলে এবং তোমাদের ল্যাবরেটারীর মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখতে হলে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তা অনুসরণ করা দরকার। তোমাদের বাড়িতে, বাড়ির আশাপাশে, পার্কে, মাঠে, রাস্তাঘাটে, পুকুর ডোবায় অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, সজাগ-দৃষ্টি নিয়ে তাদের খুঁজে বের কর, পরস্পরের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। উদ্ভিদ হলে তা সপুষ্পক কি অপুষ্পক লক্ষ্য কর। সপুষ্পক হলে তা আবৃতবীজী কি নগ্নবীজী দেখ। আবৃত বীজী হলে একবীজপত্রী কি দ্বিবীজপত্রী জানো। অপুষ্পক উদ্ভিদ হলে তা ছত্রাক, শৈবাল, মস্, ফার্ন ইত্যাদি কোন্ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সনাক্ত করতে চেষ্টা কর। এই সনাক্তকরণের কাজ আরো খুঁটিয়ে এবং যথাযথভাবে করতে হলে ঐ উদ্ভিদ বা প্রাণীটিকে পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং তাকে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তা হলে প্রয়োজনমত যে কোনও সময়ে তাদের পরীক্ষা করা যেতে পারে, শিক্ষক মশাই অথবা কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে ঠিকমত সনাক্ত করা যেতে পারে এবং তোমাদের যে সমস্ত বন্ধুরা ঐ সব গাছাপালা, প্রাণী চেনে না তাদের দেখানো যেতে পারে, চেনানো যেতে পারে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে হলো— সপুষ্পক উদ্ভিদ হলে অবশ্যই ফুল, পাতা এবং সম্ভব হলে ফল ও বীজসমেত উদ্ভিদের অংশ সংগ্রহ করতে হবে। অপুষ্পক উদ্ভিদ হলে রাইজোম ও স্পোরাঞ্জিয়াম সমেত ফার্ন সংগ্রহ করতে হবে। মস্ হলে তা রাইজয়েড ও ক্যাপস্যুল সমেত সংগ্রহ করতে হবে। শৈবাল হলে একটি মুখ বড় কাঁচের শিশিতে জলে অথবা স্পিরিটের মধ্যে তার নরম দেহ সংগ্রহ করতে হবে।

সংগ্রহের পর উদ্ভিদের এই অংশগুলি ঠিকমত সংরক্ষণ করে রাখতে হবে, নইলে পচে-গলে বা পোকায় নষ্ট করে ফেলতে পারে। উদ্ভিদের অংশগুলি দুটি খবরের কাগজের মধ্যে বা দুটি ব্লটিং পেপারের মধ্যে রেখে কোন ভারী জিনিস চাপা দিয়ে কয়েকদিন রেখে দিতে হবে। এটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে একটি খাতার মধ্যে অথবা একটি শুরু কাগজের ওপর আঠা দিয়ে তা লাগিয়ে রাখতে হবে। কচু, মূলা, গাজর, নানা জাতীয় রসাল ছত্রাক, রসাল ফল ও শৈবাল এইভাবে শুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই একভাগ ফরম্যালিনের সঙ্গে ঊনিশ ভাগ জল মিশিয়ে ফরম্যালিন দ্রবণ তৈরী করে, একটি বড় কাঁচের পাত্রের মধ্যে এই দ্রবণের মধ্যে ঐ সব উদ্ভিদের অংশগুলি ডুবিয়ে রাখতে হবে। সংরক্ষিত প্রতিটি উদ্ভিদের সঙ্গেই উদ্ভিদের সঠিক নাম, সংগ্রহের স্থান, সংগ্রাহকের নাম ও সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখতে হবে। এই সংগৃহীত বস্তুগুলি তারপর তোমাদের ল্যাবরেটারীর মধ্যে কাঁচের আলমারির একটি তাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখবে এবং প্রয়োজনমত ঐগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।

উদ্ভিদ সংগ্রহের মতো প্রাণী সংগ্রহেরও নানারকম পদ্ধতি আছে। মথ, প্রজাপতি, ফড়িং, ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে একরকম জাল পাওয়া যায়। এই জালের সাহায্যে সাবধানে পতঙ্গ ধরতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় পতঙ্গটি যেন অক্ষত থাকে। তোমরাও এইরকম একটি জাল তৈরী করে নিতে পার। তারপর পতঙ্গটিকে সাবধানে মেরে ফেলা দরকার। এজন্যে একটি মুখবড় শিশির মধ্যে তুলায় করে সামান্য ক্লোরোফর্ম অথবা বেনজিন রেখে তার মধ্যে পতঙ্গটি পুরে শিশির মুখ চাপা দিলেই পতঙ্গটি মারা যাবে। মৃত পতঙ্গটি একটি শোলার টুকরোর ওপর রেখে একটি আলপিন তার পিঠের ওপর থেকে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে ঐ শোলার সঙ্গে গেঁথে রাখতে হবে। তারপর একটি বাক্সের মধ্যে ঐ আলপিনে গাঁথা পতঙ্গগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে। বাক্সের মধ্যে কিছু ন্যাপথিলিন রাখা দরকার, নইলে পোকায় তা নষ্ট করে ফেলবে।

ব্যাঙ্ক, গিরগিটি, শামুক, কেঁচো, আরশোলা, জোঁক প্রভৃতি প্রাণী এইভাবে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অথবা গরম

জলে ডুবিয়ে মারা যেতে পারে। তারপর তাদের দেহ একভাগ ফরম্যালিনের সঙ্গে নয় ভাগ জল মিশ্রিত দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। যে সব প্রাণীর আকার বড় তাদের পেট ছুরি দিয়ে কেটে দিতে হবে যাতে দ্রবণটি খুব তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে প্রাণিদেহের পচন রোধ করে। দু'দিন পর এই দ্রবণ ফেলে দিয়ে নতুন ফারম্যালিনের দ্রবণে প্রাণীটিকে ডুবিয়ে রাখলে বহুদিন পর্যন্ত তা অবিকৃত থাকে। পাত্রের গায়ে প্রাণীটির নাম, সংগ্রহের স্থান, সংগ্রাহকের নাম ও তারিখ লেখা লেবেল লাগিয়ে রাখতে হবে। ঐগুলি তারপর তোমাদের ল্যাবরেটারীর আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখবে এবং প্রয়োজনমত ঐগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের কি পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করা হয়। প্রথমে সমগ্র জীবজগৎকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীজগৎ। তারপর উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎকে কয়েকটি পর্বে (Phylum) ভাগ করা হয়, যেমন সপুষ্পক উদ্ভিদ ও অপুষ্পক উদ্ভিদ। প্রতিটি পর্ব আবার কয়েকটি উপপর্বে (Sub-phylum) ভাগ করা হয়, যেমন আবৃতবীজী ও ব্যক্তবীজী। প্রতিটি উপপর্ব আবার কয়েকটি শ্রেণীতে (Class) ভাগ করা হয়, যেমন দ্বিদলবীজপত্রী উদ্ভিদ ও একদলবীজপত্রী উদ্ভিদ। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ এই পর্যন্ত তোমরা সকলেই করতে পারবে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। প্রতিটি শ্রেণী আবার কয়েকটি বর্গে (Order), প্রতিটি বর্গ আবার কয়েকটি গোত্রে (Family) ভাগ করা হয়। প্রতিটি গোত্র বা ফ্যামিলি কয়েকটি গণ (Genus) এবং প্রতিটি গণ আবার কয়েকটি প্রজাতিতে (Species) ভাগ করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের কাছে শ্রেণীবিভাগের একক (uit) হলো প্রজাতি। প্রজাতি বলতে এমন এক গোষ্ঠীভুক্ত জীবকে বোঝায় যারা সাধারণত নিজেদের মধ্যে পরস্পর যৌন জনন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারে সক্ষম, কিন্তু অন্য প্রজাতির কোন জীবের সঙ্গে যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারে অক্ষম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনিয়াস কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর নির্দিষ্ট নামকরণের সময় দুটি শব্দ ব্যবহারের প্রচলন করেন। প্রথম শব্দটির দ্বারা গণের নাম, দ্বিতীয় শব্দটির দ্বারা প্রজাতির নাম বোঝাতেন। যার জন্যে এই পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বি-পদ নামকরণ বা বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচার। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই বৈজ্ঞানিক নামগুলি ল্যাটিন ভাষায় রচিত—সারা পৃথিবীতেই আজ তা ব্যবহৃত হচ্ছে! নামগুলি শুনতে খটমট হলেও জীববিজ্ঞান যারা ভালবাসে তাদের কাণে এই ল্যাটিন শব্দগুলি এক অর্থবহ সুরেলা ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে, বার বার উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া এই ল্যাটিন শব্দগুলির মানে বুঝলে তা মনে রাখা খুব সহজ হয়। রবার গাছের ল্যাটিন নাম ফাইকাস্ ইলাস্টিকা। ইলাস্টিক রবারের জন্যে প্রজাতির নাম দেওয়া হয়েছে ইলাস্টিকা। অশ্বত্থ গাছের নাম ফাইকাস্ রিলিজিওসা। নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাছটি জড়িত বলে এই নাম। আর ফাইকাস্ শব্দটি এসেছে ফিগ্ বা ডুমুর থেকে। কেননা এই রবার, অশ্বত্থ, বট সবই ডুমুর জাতীয় গাছ। ডুমুরের মত এদের ফুল হয় যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। জীববিজ্ঞানীদের নাম অনুসারে বহু প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ভ্যাণ্ডা রক্সবার্ণী আমাদের দেশের একটি অর্কিডের নাম। বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ উইলিয়াম রক্সবার্গের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়েছে। তেমনি ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা উদ্ভিদটি বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ ল্যামার্কের নাম অনুসারে করা হয়েছে। সেগুন গাছের নাম টেকটোন গ্রাণ্ডিস্। ল্যাটিন ভাষায় টেকটোন শব্দটির অর্থ হলো ছুতার। ছুতারদের প্রিয় এবং তাদের কাজের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই ল্যাটিন নামগুলি বেশ মজার এবং অর্থবহ এবং প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু সুর ও ঝঙ্কারের অনুরণন আছে। সেটা বোঝবার মতো তোমাদের কাণকে তৈরী করতে হবে ধীরে ধীরে। তা হলে একসঙ্গে অনেক নাম মনে রাখা সহজ হয়ে উঠবে। এজন্যে সঙ্গে একটা নোটবুক রাখবে, যখন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী দেখবে তার বাংলা নাম এবং বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখে রাখবে। তোমার ল্যাবরেটারীতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংরক্ষণ করে রাখবে, সেখানেও বাংলা নামের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখে রাখবে যত্ন করে।

বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-19

শরীরের শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রণ

সিদ্ধার্থ রায়

গ্রীষ্মকালে ঘেমে নেয়ে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন যদি একটু হাওয়া বয় অথবা একটা পাখা ঘোরে, বেশ ভালো লাগে। অথচ সেই হাওয়াই যদি শীতের রাতে বইতে থাকে তবে আমরা লেপের তলায় ঢুকেও পার পাই না, হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগে। কি মুশকিল, গরম হলেও কষ্ট আর ঠাণ্ডা পড়লেও অসুবিধা! আমাদের এইরকম শারীরিক দুঃখকষ্টের মূল কারণ আমরা উষ্ণ রক্তের জীব। আর এই উষ্ণ রক্তের জীবন ধারণের জন্যে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আমাদের 37° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের (98·4 ডিগ্রি ফারেনাইট) দু-এক ডিগ্রির মধ্যে সর্বদা রাখতে হয়। শীত গ্রীষ্ম ভেদে শরীরকে এই এক তাপমাত্রায় রাখবার জন্যে অবশ্য আমাদের শরীরের মধ্যেই রয়েছে শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখবার জন্যে যন্ত্রকে যত বেশি চেষ্টা করতে হয়, শরীরের কষ্ট তত বাড়ে আর যন্ত্র যত কম কাজ করে, শরীরের তত আরাম।

এবার দেখা যাক শরীরের শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটার কাজ কি। কেনই বা তাকে মাঝে মাঝে বেশি কাজ করতে হয়, আবার কেনই বা সময় সময় বন্ধ থাকলেও চলে। আমরা যে সব খাবার খাই আর প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করি, দুটোতে মিলে শরীরের মধ্যে নানা-রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যাকে আমরা বিপাক বলি, অনবরত তাপশক্তি তৈরী হয়। মানুষের ক্ষেত্রে তাপ উৎপাদনের বিপাকীয় হারের ঊর্ধ্বসীমা নির্ভর করছে শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রার উপর, কিন্তু নিম্নসীমা মোটা-মুটিভাবে নির্দিষ্ট একটা মাত্রার নিচে নামে না। নিচের সারণীতে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের আভ্যন্তরীণ তাপ উৎপাদনের হার কায়িক শ্রমের সঙ্গে কিরকমভাবে বাড়ে কমে তা দেখানো হয়েছে ঃ

শারীরিক কাজ/শ্রম	বিপাকীয় হার
1. নিদ্রা বা পূর্ণ বিশ্রাম	৫0-100 ওয়াট
2. বিনা শ্রমে বসে থাকা	100-140 ,,
3. হালকা কায়িক শ্রম	140-200 ,,
4. হাঁটা ইত্যাদি মধ্যমাত্রার শ্রম	200-400 ,,
5. অত্যধিক শ্রম, খেলাধূলা ইত্যাদি	400-800 ,,

এইবার দেখা যাক বিপাকীয় তাপ উৎপাদনের সঙ্গে আমাদের শরীরের উষ্ণতার সম্পর্কটা কি। শরীরের মধ্যে অনবরত যে তাপ তৈরী হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা শরীরের মধ্যে জমাতে পারি না। কারণ তা হলে শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তে থাকে আর সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে কষ্টও। সুতরাং যে হারে তাপ তৈরী হচ্ছে সে হারেই শরীর থেকে তাপ বাইরে ছড়িয়ে ফেলতে হবে। অনায়াসে এটা করতে পারলেই তাপ সম্বন্ধীয় শারীরিক কষ্টের অবসান ঘটে।

তাপবিজ্ঞানের খুব গোড়ার কথা হিসাবে এটা জানা আছে নিশ্চয়ই যে, উষ্ণতর পদার্থ থেকে তাপ সর্বদাই শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। তাপ প্রবাহ বা চলাচলের আবার রকমফের আছে। তিন রকমভাবে তাপ প্রবাহিত হতে পারে ঃ পরিচলন, বিকিরণ এবং পরিবহন। শরীর থেকে তাপ হারানোর ক্ষেত্রে কিন্তু তৃতীয় প্রক্রিয়াটি বিশেষ কাজে লাগে না। সেক্ষেত্রে দেহনির্গত ঘামের বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটি খুবই কার্যকর।

পরিচলন প্রক্রিয়াটি ঘটে হাওয়ার মাধ্যমে। উষ্ণ ত্বকের সান্নিধ্যে এসে হাওয়া গরম হয়ে ওঠে এবং সেই সুবাদে শরীরের কিছুটা তাপ নিয়ে নেয়। গরম হয়ে হাওয়া উপরের দিকে উঠতে থাকলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া তার জায়গা নেয়। এইভাবে ক্রমাগত পরিচলন ঘটতে থাকে। যদি হাওয়া বইতে থাকে, তবে পরিচলন খুবই দ্রুত ঘটতে থাকে। পাখা চালিয়ে হাওয়ার বেগ দ্রুত করে আমরা অতিরিক্ত তাপ শরীর থেকে বের করে দিতে পারি। কৃত্রিমভাবে ঘটানো এই প্রক্রিয়াকে আমরা কৃত্রিম পরিচলন বলি।

বিকিরণ প্রক্রিয়াটির জন্যে কিন্তু কোন মাধ্যম লাগে না। তাপ বিকিরণ ঘটে তাপতরঙ্গের সাহায্যে যা শূন্যের মধ্যে দিয়েও যাতায়াত করতে পারে। সূর্য থেকে আলো ও তাপ এইভাবেই মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে আসে। এই যাতায়াত কিন্তু ঘটে সরল রেখায়, যার ফলে রোদ আমাদের শরীরের যেদিকে এসে পড়ে, সেইদিক-টাই গরম হয়ে ওঠে।

আমরা যখন বিশ্রাম অথবা লঘু পরিশ্রম করি, তখন বিপাকীয় তাপের কমবেশি 75 শতাংশ এই পরিচলন ও

বিকিরণ প্রক্রিয়াতে শরীরের বাইরে ত্যাগ করা হয়। কিন্তু বাইরের উষ্ণতার হেরফেরের সঙ্গে শরীর থেকে তাপ হারানোর হার কমবেশি হওয়ার ফলে আমাদের শরীরের উষ্ণতা যদি আরাম সীমার বাইরে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যার বৈজ্ঞানিক নাম Vasomotor regulation। এটাই শরীরের শৈত্যতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো আমাদের ত্বকের নিচেই যে রক্তবাহী শিরাউপশিরার জাল রয়েছে সেগুলিকে সংকুচিত বা প্রসারিত করা। পরিবেশ গরম হলে এই শিরাগুলি প্রসারিত করে এর মধ্যে দিয়ে প্রচুর রক্ত প্রবাহের বন্দোবস্ত করা হয়, যার ফলে চামড়ার উষ্ণতা বাড়ানো যায় প্রায় 35° সেণ্টিগ্রেড অবধি। চামড়ার উষ্ণতা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে দরকার মতো বেশি করা হয়, যাতে শরীর থেকে তাপ সহজে বাইরে প্রবাহিত হতে পারে। শীতের দিনে ঘটে ঠিক এর বিপরীত। আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় শরীর অতি সহজে তাপ হারাতে থাকে। শরীরের উষ্ণতা যাতে মাত্রাতিরিক্ত কমে না যায় তার জন্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি এবার চামড়ার নিচে শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল কমিয়ে দিয়ে গায়ের উষ্ণতা নামিয়ে আনে, যার ফলে তাপ হারানোর হারও কমে আসে। চামড়ার উষ্ণতা কমানো কিন্তু বেছে বেছে করা হয়। শরীরের মাঝখানে অর্থাৎ বুক, পেট, পিঠ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো কিন্তু ততটা ঠাণ্ডা করা হয় না, যতটা করা হয় হাতপা ইত্যাদি কম দরকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে। এজন্যেই শীতকালে আমাদের হাত-পাগুলো আগে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বরফের রাজ্যে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে গরম রাখবার তাগিদে শরীর হাতপাগুলোকে প্রায় বাইরের বরফের উষ্ণতায় নামিয়ে আনে বরফক্ষত হওয়ার ভয় সত্ত্বেও। শীতের চোটে কাঁপতে থাকাও শৈত্যতাপ যন্ত্রের আরেকটি স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া, যাতে আভ্যন্তরীণ তাপ উৎপাদনের বিপাকীয় হার বেশি হয় এবং শরীর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। শীতকালে গরম পোষাক পরা মানে দেহ ও বাইরের মধ্যে একটা অপরিবাহী আস্তরণের বন্দোবস্ত করা। এর ফলে প্রথমত বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে পরিচলন ঘটাতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত দেহের উষ্ণতা পোষাকের ভিতরের দিকটা গরম করলেও বাইরের দিকটা বেশ ঠাণ্ডাই থাকে। ফলে দেহের উন্মুক্ত অংশে থেকে যতটা বিকিরণ ঘটবার ঘটলেও, পোষাকের বহির্ভাগ থেকে বিকিরণ ঘটে খুবই কম। অর্থাৎ দেহের তাপ বাইরে আসে খুবই কম। একই কারণে গ্রীষ্মে গায়ে জামা রাখতে ইচ্ছে করে না, যাতে বিকিরণ ও পরিচলন পুরো মাত্রায় ঘটতে পারে।

বাইরের তাপমাত্রা যখন 30° সেঃ-এর উপর, তখন কিন্তু উপরে বর্ণিত রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের আরাম বজায় রাখা সম্ভব নয়। বাইরের তাপমাত্রা যখন 35° সেঃ-এর উপরে, পরিচলন ও বিকিরণের সাহায্যে দেহের তাপ বাইরে যাওয়ার বদলে, বাইরের থেকে শরীরে তাপ প্রবেশ করতে থাকে। এরকম অবস্থায় শৈত্যতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের একমাত্র উপায় হলো ঘর্মগ্রন্থিকে সক্রিয় করে ঘাম ঝরানো আর তার বাষ্পীভবনের সাহায্যে দেহ থেকে তাপ বের করে দেওয়া। যে হারে তাপ দূর করা দরকার তার সমানুপাতিক আয়তক্ষেত্রের উপর বিস্তৃত ঘর্মগ্রন্থি-গুলোকেই সক্রিয় করে তোলা হয়। ঘাম বাইরে এসে শরীরের তাপ নিয়েই বাষ্পীভূত হয়। শীতলীকরণের এই প্রক্রিয়াটি খুবই শক্তিশালী। কারখানায় গরম পরিবেশে কাজ করবার সময় একজন লোক ঘণ্টায় এক কেজি হারে ঘেমে এবং তাকে বাষ্পে পরিণত করে প্রায় 680 ওয়াট হারে তাপ পরিত্যাগ করতে পারে। বলাই বাহুল্য খরচ হয়ে যাওয়া জল ও নুন ঘন ঘন পূরণ করা দরকার, নইলে জল ও নুন হীনতায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। ভ্যাপসা গরমের দিনে যখন বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি, অথবা যখন একদম হাওয়া বয় না, আমাদের শরীর ও জামার মধ্যের হাওয়া পুরোপুরি আর্দ্র হয়ে পড়ে এবং ঘাম আর বাষ্পে পরিণত হতে চায় না। এই অতিরিক্ত ঘাম, যা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, তা কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা করার কোন কাজেই আসে না। এই সময় পাখার হাওয়া অর্থাৎ কৃত্রিম পরিচলন ছাড়া আর কিছুই কার্যকর নয়।

37/2 গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলি-31

পড়াশোনা

তিন সমস্যার একটি

নন্দলাল মাইতি

কবি বলেছেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' সত্যি কথা বলতে কি, বাস্তবে এই পৃথিবী কতখানি সুন্দর বলা মুশকিল। এখানে দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, হিংসা, লোভ ইত্যাদির অন্ত নেই। আর আছে জীবনের পদে পদে নানা সমস্যা ও সঙ্কট। এইসব সমস্যা-সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে ওঠে। কথায় আছে, জীবন সুখশয্যা নয়। কেবলমাত্র বড়রাই যে সমস্যার মুখোমুখী হন তা নয়। ছোটদেরও প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত রকমের সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়। তাদের প্রতিদিনের আচার-আচরণে, খেলার মাঠে, আর পড়াশোনায় কত সমস্যা আসে। এসব তাদের মোকাবেলা করতে হয়, সমাধান করতে হয়। একটু ভেবে দেখলে মনে হয় এই পৃথিবীতে সমস্যা আছে বলে তা সুন্দর, জীবনে সমস্যা আছে বলেই তা সুন্দর। যে জীবনে সমস্যা নেই, কোন ভাবনা-চিন্তা নেই, তা এক-ঘেঁয়ে, অচল, গতিহীন।

গ্রীকদের গণিতে তেমন তিনটি সমস্যা ছিল। সে মহা সমস্যা। তার একটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। এই সমস্যাটি হচ্ছে যে, কোণকে সমান তিন ভাগে করা। দেখেই মনে হতে পারে এটা আর এমন কি সমস্যা যার সমাধান সম্ভব নয়! কারণ আমরা তো অনেকেই কোণকে ভাগ করে থাকি, আর জ্যামিতিতে কোণকে কিভাবে ভাগ করতে হয় তা তো ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই শিখতে হয়।

হ্যাঁ. জ্যামিতিতে আমরা কোণকে ভাগ করে থাকি। আমরা প্রায়ই কোন স্থূলকোণ বা সূক্ষ্মকোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করি অর্থাৎ সমান দুভাগে ভাগ করি। আর এই কাজটি করার জন্যে আমরা দুটি যন্ত্র ব্যবহার করি। একটি রুলার, আর একটি কম্পাস। কাঁটা, চাঁদা, আরো কয়েকটি যন্ত্র থাকলেও এক চাঁদার ব্যবহার ছাড়া অন্যগুলির ব্যবহার করি না বললেই চলে। আর তার একটা খুব বেশিই দরকারও পড়ে না।

যদিও আমরা সবাই যে-কোন কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে জানি, তবুও পুরোনো ব্যাপারটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক্। কোণের সমদ্বিখণ্ডীকরণ সম্পর্কে যে ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তার দু-একটি কথা সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যাক।

সাধারণত কোন নির্দিষ্ট কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে বলা হয়। যেমন 30°, 45°, 75°, ইত্যাদি ; আবার কোন অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যে-কোন কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে বলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট কোণটি চাঁদার সাহায্যে খাতায় এঁকে তারপর কম্পাসের সাহায্যে সমদ্বিখণ্ডিত করি ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একই-ভাবে কাজটি সম্পন্ন করি, কেবল চাঁদার সাহায্যে খুশীমত একটা কোণ এঁকে নিই। পাশে 45° ও 75° দুটি কোণের সমদ্বিখণ্ডিত রূপ দেখানো হলো।

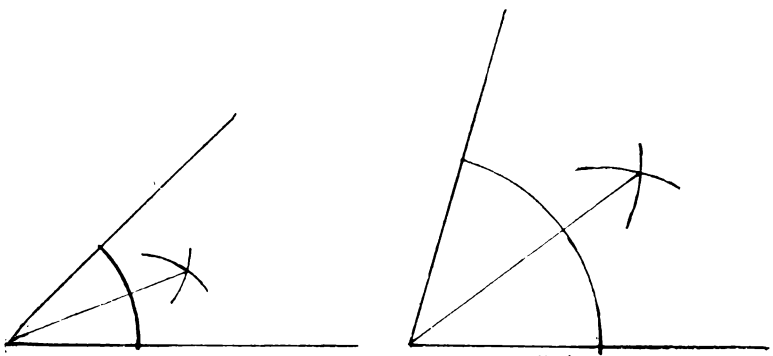

চিত্র - 1

গ্রীকদের বিখ্যাত সমস্যায় ফিরে আসা যাক্। গ্রীকরা যে-কোন কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করতে পারে নি। অবশ্য যে-সব বিধি-নিয়ম এতে আছে তা মেনে আমরাও পারি নি। কিন্তু তারা দুটি মাত্র কোণকে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে পেরেছিল. আর আমরাও সবাই পারি। এই কোণ দুটির পরিমাণ 90° ও 180° কোণ। দুটিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করা তেমন কঠিন নয়—আমরা সহজেই

করতে পারি। এখানে 180° কোণকে কিভাবে সমান তিন ভাগে ভাগ করা যায় তার সামান্য আলোচনা করা যাক।

2নং চিত্রে AB যে-কোন সরলরেখা ; এর উপর O যে-কোন বিন্দু। O বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করা হলো। এই অর্ধবৃত্ত AB সরল রেখাকে D ও E বিন্দুতে ছেদ করল। এবার E-কে কেন্দ্র করে

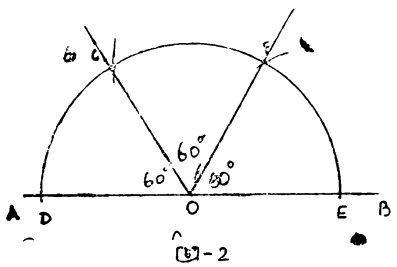

চিত্র-2

পূর্ব বৃত্তচাপের সমান বৃত্তচাপ অঙ্কন করা হলো এবং তা অর্ধবৃত্তকে F বিন্দুতে ছেদ করলো। আবার F-বিন্দুকে কেন্দ্র করে পূর্বের বৃত্তচাপের সমান বৃত্তচাপ অঙ্কন করা হলো এবং তা অর্ধবৃত্তকে G বিন্দুতে ছেদ করলো।

এখন 180° সমান তিন অংশে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেক অংশের মান 60°।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, আমরা 180° কোণকে সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম, এখানে রুলার আর কম্পাস ছাড়া আমরা অন্য কোন প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করি নি। গ্রীকদের জ্যামিতিতে এই বিধি-নিষেধ ছিল যে, তারা রুলার-কম্পাস ছাড়া অন্য কোনপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। এই নিষেধ আরোপ করেন প্লেটো। তিনি ছিলেন সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচীনকালের সর্বপ্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর বিদ্যাপীঠ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'অ্যাকাডেমী'। এই অ্যাকাডেমীর তোরণ-দ্বারে লেখা ছিল, "Let no one who is unacquainted with geometry enter here," অর্থাৎ জ্যামিতিতে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। এখানে প্রধানত দর্শনচর্চা হলেও জ্যামিতির উপর খুব জোর দেওয়া হত। প্লেটো মনে করতেন গণিতে ভাল জ্ঞান না থাকলে দর্শন পড়া যায় না। প্লেটোর মৃত্যুর পর একবার এক তরুণ দর্শন পড়ার জন্যে অ্যাকাডেমীতে আসে। অধ্যক্ষ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ছাত্রটির জ্যামিতিতে কোন জ্ঞান নেই। তখন অধ্যক্ষ, জেনোক্রেটিস বললেন, 'তুমি যাও, দর্শন পড়ার যোগ্যতা তোমার নেই। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ প্লেটোর প্রভাব এড়িয়ে কোন কিছু করার উপায় ছিল না তখন।

প্লেটোর বিধি-নিষেধ সত্বেও কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রীক গণিতজ্ঞ মাথা ঘামিয়েছেন ও সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। সর্বপ্রথম এই সমস্যা সমাধানে যিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর নাম হিপিয়াস। ইনি ছিলেন এলিসের অধিবাসী এবং প্লেটোর গুরু দার্শনিক সক্রেটিসের সমসাময়িক। কিন্তু কেবলমাত্র রুলার-কম্পাস ব্যবহার করে তিনি কোন সমাধান দিতে পারেন নি।

আর্কিমিডিসের নাম আমরা সবাই জানি। স্কুলের নিচের ক্লাশ থেকেই তাঁর নিয়ম শিখতে হয় বিজ্ঞানে। আর্কিমিডিস বিশ্বের তিন জন গণিতজ্ঞের একজন। গণিত ও বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা পুরোনো ধরনের নয়— একেবারে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞের মতো। তাঁর বহু আবিষ্কার আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কিভাবে কখন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা তো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি যখন জ্যামিতিক গবেষণায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মগ্ন ছিলেন, সে-সময় রোমান সৈন্যরা তাঁর কক্ষে ঢুকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী বলে উঠলেন, 'আমার বৃত্ত নষ্ট করো না।' অমনি মদগর্বী রোমান সৈন্য তরবারীর আঘাত তাঁর মৃত্যু ঘটায়। এই সম্পর্কে বিখ্যাত এক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞের চমৎকার একটি উক্তি আছে। মনীষী হোয়াইটহেড বলেন, 'আর্কিমিডিস তপস্যায় মগ্ন ছিলেন বলেই রোমান সৈন্যরা রক্ষা পেয়েছিল, তা না হলে তাদের আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হত না।' বলা বাহুল্য, কথাটি সরস হলেও পুরোপুরি সত্য।

যাই হোক, আর্কিমিডিসও প্রাচীন এই সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। আর তিনি যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন তা যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও সমস্যাটি যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আসলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, তা এখানে আলোচনা করা গেল না। কারণ গণিতে আরো একটু বেশি জ্ঞান না থাকলে তা বোঝা যাবে না।

আর্কিমিডিস সমস্যাটির সমাধান যেভাবে করেছিলেন, তাতে তাঁর কৃতিত্ব অধিক। কারণ, এ ধরনের আলোচনা অন্য কোন গণিতজ্ঞ প্রাচীনকালে অর্থাৎ তাঁর আগে

করেন নি। তিনি অবশ্য রুলার-কম্পাসই ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু রুলারের ব্যবহার একটু অন্যভাবে করেছিলেন।

3নং চিত্রে x যে কোন কোণ। x-কোণের ভূমিকে বাঁ দিকে সম্প্রসারিত করা হলো। O-কে কেন্দ্র করে যে-কোন r ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করা হলো।

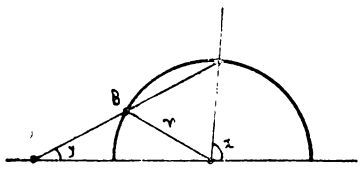

চিত্র-3

রুলারের উপর A ও B এমন দুটি বিন্দু নেওয়া হলো যেন উভয়ের দূরত্ব r-ব্যাসার্ধের সমান হয়। অর্থাৎ AB = r হয়। এবার অর্ধবৃত্তের উপর এমন একটি স্থানে B বিন্দুটি স্থাপন করা হলো যেন রুলারের উপর চিহ্নিত A বিন্দু সম্প্রসারিত ভূমির উপর পড়ে এবং রুলারের অপর প্রান্ত অর্ধবৃত্ত ও কোণের অপর বাহুর ছেদবিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়। রুলারটিকে ঠিক এরূপ অবস্থায় রেখে সরলরেখা অঙ্কন করা হলো।

এখন, যে y কোণটি উৎপন্ন হলো তা x কোণের এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ $y = x/3$

আপাত সহজ ও সরল মনে হলেও অনেক সময় তা তত সহজ ও সরল হয় না। গ্রীকদের তিন সমস্যার এইটি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার অনেক সময় আপাত কঠিন মনে হলেও আসলে তা অতি সহজ হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন সমস্যাই একটু তলিয়ে দেখতে হয়, সামান্য প্রচেষ্টা ও জেদ থাকা চাই। এরূপ মানসিকতা, প্রবণতাই প্রকৃত সাফল্য আনে। গণিতের ক্ষেত্রে কথাটি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। গণিতে সমস্যাই সুন্দর, সমস্যাই কাম্য, সমস্যা সমাধানেই সাফল্য ও আনন্দ।

ঠাকুরানী চক, হুগলী

টুংগুস্কার আজব ঘটনা

শচীনাথ মিত্র

1908 সালের 30 জুন। সকাল 7টা 15 মিনিট। সাইবেরিয়ার মহারণ্যের উত্তর প্রান্তে টুংগুস্কা নদী আধা বরফ জমা অবস্থায় ধীরে প্রবাহিত। এই সময়ে টুংগুস্কার উপরের গোটা আকাশ হঠাৎ তীব্র আলোকে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে আর পরমুহূর্তে কয়েক মেগাটন পারমাণবিক বোমার শক্তিতে এক বিস্ফোরণ ঘটলো।

সোভিয়েট রাশিয়ায় তখন জারের আমল। মহাবিপ্লবের মঞ্চ তৈরীতে গোটা দেশটা খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায়। ফলে ঘটনাটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাবার অবকাশ কারও হয় নি। তার পরে তের বছর কেটে গেল।

1921 সালে কুলিক নামে একজন ভূ-বিজ্ঞানী সাইবেরিয়ার ঐ বাসভূমি অঞ্চলে মণিক সংগ্রহ করতে গিয়ে 24 মাইল ব্যাসযুক্ত এক বৃত্তাকার স্থান পুরোপুরি বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। ওখানে যা কিছু ধাতব বস্তু ছিল তা গেছে গলে, বনের সমস্ত রাইনহরিণের দল বিধ্বস্ত। আর সব চাইতে বেশি লক্ষণীয় হলো ছাল বাকলা—ওঠা বিশাল মহীরুহগুলো দেশলাই কাঠির মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে জাপানী পাখার মতো এক কেন্দ্রাভিমুখী। ওখানকার স্থানীয় ভবঘুরেরা জানালো যে, তারা ঐ সময়ে আকাশ থেকে এক বিশাল আগুনের গোলাকে নেমে আসতে দেখেছিল সাইবেরিয়ার ঐ জঙ্গলের দিকে। তার কিছু পরেই একটা উঁচু অগ্নিস্তম্ভ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এই জ্বলন্ত স্তম্ভটিকে বহুদূর থেকে দেখা গিয়েছিল, এমন কি 250 মাইল দূরে অবস্থিত কিরেনস্ক্ নগর থেকেও।

ঘটনাস্থলের 20 মাইল দূরে বসেছিল এক চাষী তার

কুটিরের দাওয়ায়। সে বলে: 'ঐ ঘটনার সময় হঠাৎ বাইরের তাপ ও আলো এত বেড়ে যায় যে আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে আর থাকতে পারলাম না। আমার শার্ট গরম হয়ে আমার পিঠ পুড়িয়ে দিচ্ছিল। তারপর আলো অদৃশ্য হতেই সমস্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং ভয়ংকর বিস্ফোরণের আওয়াজের এমন জোরালো এক ধাক্কা আসে, যাতে আমি কয়েক ফুট দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু সামান্য ক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে পেতেই এমন এক বিকট আওয়াজ শুনি যার জোরে আমার গোটা বাড়িটা এমনভাবে নড়ে ওঠে যেন ওটা ভিতশুদ্ধ উপড়ে পড়বে।

এই ঘটনার পর তিন দিন-রাত্রি ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার বহু জায়গার উঁচু পাহাড়ে জায়গা থেকে উত্তর দিকে এক বিভীষিকাময় জ্বলন্ত মেঘ দেখা যাচ্ছিল। আর ঐ ঘটনা উদ্ভূত শব্দ-তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে দু-বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিল এবং ঐ ভূ-কম্পন লণ্ডন, পোটস্‌ডাম ইত্যাদি পৃথিবীর বহু সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়েছিল।

এই ঘটনার 13 বছর পরে বিজ্ঞানীরা এর কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এবং বহু গবেষণা করে যে কয়টি ধারণা করা হয়েছে তা নিচে আলোচনা করছি।

একদল (ভূ-বিজ্ঞানী কুলিকসহ) বলছেন, এটা একটা নিছক বৃহদাকৃতির উল্কাপাতের ঘটনা।

কিন্তু সমস্যা হলো, এখানে কোনো উল্কাপাত জনিত গহ্বর খুঁজে পাওয়া যায় নি বা উল্কার কোনো টুকরো মাটির মধ্যে পাওয়া যায় নি।

আর তাছাড়া 24 মাইল ব্যাস বিশিষ্ট যে গোলাকার অঞ্চলে সমস্ত গাছগুলি ভূ-পাতিত হয়েছিল তাদের অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রাভিমুখী অংশগুলি বেশি দগ্ধ। এতে অনেকে মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, ঐ কেন্দ্রে কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল; তবে মাটি থেকে কিছুটা উপরে যার ফলে কোনো গর্ত বা 'ক্র্যাটার' সৃষ্ট হতে পারে নি।

অন্য দলের বিজ্ঞানীরা ভাবেন যে, কোনো ধূমকেতু বোধ হয় এনকে (Encke) ধূমকেতু-র মাথা ঐখানে পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। ধূমকেতুরা যেহেতু খুব হাল্কা জমানো বায়বীয় পদার্থে (যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) তৈরী সেহেতু তাদের কোনো চিহ্ন নেই বা ঐ জমাট-বাঁধা বায়বীয় পদার্থের ধাক্কায় কোনো খাদের সৃষ্টি হয় নি।

দেশলাই-এর কাঠির মতো কেন্দ্রাভিমুখী পতিত গাছ-পালার উপর চাপের গবেষণা করে অনুমান করা হয় যে, ঐ এনকে ধূমকেতু পৃথিবীয় বায়ুমণ্ডলে মাটি থেকে কয়েক কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে প্রজ্বলিত হয়ে ফেটে পড়ে যার পরিমাণ 10 মেট্রিক টন T N T-এর শক্তির সমান ছিল। অবশ্য কয়েকটি গোলাকৃতির ছোট ছোট কাঁচের দানা ছাড়া আর কোন প্রামাণ্য বা সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি।

এর চাইতে আরও কল্পনাসমৃদ্ধ ধারণা কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা করেছেন। যেমন,

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ওয়ালটার লিবি'-র মত লোক মনে করেন যে, ওখানে একদলা এণ্টি-ম্যাটার (anti-matter) মহাশূন্য থেকে হঠাৎ পৃথিবীর কয়েক দল 'ম্যাটার'-এর সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস হয় এবং প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করে।

আবার অন্য কেউ কেউ ভাবছেন যে, ওখানে একটা ছোট ব্ল্যাক হোল (black hole) এসে পড়েছিল। যার আঘাতের প্রচণ্ড শক্তিতে সাইবেরিয়ার গাছপালা ধ্বংস হয়েছিল; কিন্তু কোনো বড় খাত তৈরী না করেই পৃথিবীকে ফুঁড়ে কেন্দ্র অতিক্রম করে অপর দিক থেকে আবার মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত পরেই।

পঞ্চম কল্পনা একেবারেই সায়েন্স ফিকশান্ স্তরের। সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আগত কোনো উড়ন্ত চাকতি (বা flying saucer) পৃথিবীতে নামবার আগেই ওর নিজস্ব পারমাণবিক জ্বালানী হঠাৎ ফেটে ওকে ধ্বংস করে ফেলে। কিছু স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন যে, তারা বিধ্বংসী ঘটনার কিছু আগে এরকম এক জ্বলন্ত চাকতিকে আকাশে আঁকাবাকা পথে ঘুরতে দেখেছিল।

ওখানকার মাটিতে অবশ্য তেমন তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ে নি, যাতে অনুমান করা যায় যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। অর্থাৎ UFO-এর পতন বা ধ্বংস নেহাতই গপ্পো।

1908 সালের টুংগুস্কার ঘটনা তাই এখনও রহস্যময় হয়ে রয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-32

বায়োলজিক্যাল ক্লক

শ্রীধর সেনাপতি

অনেক গাছপালা উদ্ভিদ্ আর প্রাণী নিজেদের ভেতরে একটা বিশেষ ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছে, যে-ক্ষমতা ফুল ফোটানো আর পাখিদের সুদূর পথে পাড়ি দেওয়ার মতো বিচিত্র প্রয়োজনীয় কাজের পরিচালনায় সাহায্য করে থাকে। ওই বিশেষ ক্ষমতাকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন Biological Clock, অর্থাৎ জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত ঘড়ি।

প্রতি বছর শীতকালে দূর দূর দেশ থেকে আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানায়, সুন্দরবনে পাখিদের আস্তানায় যাযাবর পাখির দল আসে আমরা সবাই তা জানি। কিন্তু তাতে অবাক লাগে না কি, পাখিগুলো অত দূর থেকে পথ চিনে কী করে এখানে এসে হাজির হয় আর শীত ফুরোলেই আবার ফিরে যায় নিজেদের দেশে?

অমন একটা কাজ করতে হলে মানুষের তো নানান্ ঝক্কি! ম্যাপ আনো রে। একটা কম্পাস আনো রে! কৌণিক ব্যবধান মাপার জন্যে একটা সেক্সট্যান্ট চাই। সময়ও তো মেপে দেখতে হবে। তা ক্রনোমিটার কই? ইত্যাদি কত না ঝামেলা! তুলনায় মানুষের ভেতরে ওই বিশেষ ক্ষমতার বিকাশ তেমন জোরালোভাবে ঘটে নি।

মানুষের মধ্যে আছে একটা মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টার আবর্তনকাল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঘটে যাওয়া, অর্থাৎ প্রাত্যহিক এই পর্যাবৃত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রায়শ ইংরেজিতে একটা কথা ব্যবহার করা হয় 'Circadian Cycle, ল্যাটিন শব্দ circa, ইংরেজিতে 'about' আর 'dies'—'a day' অর্থাৎ প্রায় একটা দিন। যাদের ভেতরে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, তাদের এই আবর্তনকালের দৈর্ঘ্যে সাধারণত কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও তারা প্রকাশ করে থাকে।

দুটো একই জাতের মটরশুঁটি অঙ্কুরিত হওয়ার আবর্তনকাল যথাক্রমে তেইশ আর পঁচিশ ঘণ্টা হতে দেখা গেছে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ যথাযথতা নিয়ে তাদের ওই বায়োলজিক্যাল ক্লক্ কাজ করে না, এমন অভিযোগ উঠতেই পারে। সৌভাগ্যবশত এই ধরনের ঘড়িগুলোর ভুলের পরিমাণ মারাত্মক হয়ে ওঠার আগে প্রতিদিনের সূর্যই তাদের ফের সারিয়ে তোলে। যদি তা না হত, তা হলে পঁচিশ ঘণ্টার ঘড়ি নিয়ে একটি সকালের গৌরব শীগ্‌গির দিনের সঙ্গে বেরিয়ে যেত। ভোরের ফুল দেখা যেত গোধূলিতে!

জন্ হিল ছিলেন একজন ইংরেজ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী। হিল্ মটরশুঁটিকে রাত্রে কৃত্রিম আলোতে আর দিনের বেলা অন্ধকারের মধ্যে খোলা অবস্থায় রেখে স্বাভাবিক দিন-রাতের আবর্তনকালকে সংরক্ষিত করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে মটরশুঁটিদের সমতাল গতি (Rhythmic movements) তাঁর ওই "দিন" এবং "রাতে"র নতুন পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল দ্রুততালে। তার সংশোধিত আলোকপাতের সময়তালিকা বায়োলজিক্যাল ক্লক্‌কে পুনঃস্থাপন করেছিল।

মানুষের মধ্যে প্রধান Circadian Cycle হলো ঘুমের আর ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার দৈনন্দিন সমতাল গতি। মানব সম্বন্ধীয় প্রতিদিনের অন্যান্য আবর্তনকালের বেশির ভাগ, যেমন হরমোনের মধ্যে এবং দৈহিক তাপের তারতম্য ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা কালচক্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে বলে অনুমিত হয়। হয়তো বা সেটার দ্বারা পরিচালিতও।

তবে উদ্ভিদ্ আর প্রাণীদের মতো মানুষের বায়োলজিক্যাল ক্লক্ কিন্তু কদাচিৎ নির্ভুলভাবে সক্রিয় থাকে। এক সময় জনৈক ভদ্রলোক একা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে 105 দিন কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। প্রতিদিন রাত্রে তাঁর ঘুম পেত একটু একটু দেরী করে। গড় হিসেবে তাঁর অভ্যন্তরীণ 'দিন' সচল ছিল 24·7 ঘণ্টা।

বিষয়টি নিয়ে 1938 সালে হয়েছিল দুটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক কেন্‌টাকি'র Mammoth Cave-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন 32 দিন। ওই দুই ব্যক্তি গুহার ভেতর 28 ঘণ্টার আবর্তনকালের মধ্যে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন। 19 ঘণ্টা জেগে থাকতেন, ঘুমতেন 9 ঘণ্টা।

এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রুস রিচার্ডসন, তখন তাঁর বয়স 23 বছর, নিজের বায়োলজিক্যাল ক্লক্‌টিকে বেশ পুনর্বিন্যাস করে নিয়েছিলেন। কিন্তু 43 বছরের নাথানিয়েল ক্লিট্‌ম্যান তাতে পরিবর্তন আনতে পারেন নি। তাঁর 'ঘড়িটা' 24 ঘণ্টার খুব কাছাকাছি আবর্তনেই বাঁধা ছিল। রিচার্ডসন যখন জেগে থাকতেন, তখন তাঁর দেহের উত্তাপ নিয়মিতভাবে একটা উচ্চতার পরিমাপ স্পর্শ করত। আবার সেটা নেমে আসত যখন তিনি ঘুমতেন।

কিন্তু ক্লিট্‌ম্যানের পক্ষে তেমনটা ঘটে নি। তার

ফলে কী হয়েছিল? রাত্রে ক্লিট্‌ম্যান ঘুম-ঘুম চোখে শুধুই ছট্‌ফট করতেন আর দিনের বেলায় তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়েই থাকত।

দেখা গিয়েছে, স্বাভাবিক 24 ঘণ্টা অবস্থাগুলোর ভেতরে মানুষের বায়োলজিক্যাল ক্লক্ সহজে বশে থাকে। একটুআধটু পরিবর্তনও মেনে দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সময়ে জাহাজ যাওয়ার কালে জাহাজের মানুষদের দৈহিক তাপের আবর্তনকালও ওই সময়ের সঙ্গে পাশাপাশি চলে। এটা সাধারণত বেশি বেড়ে যায় প্রতিদিন একই স্থানীয় সময়ে।

জেট্ এয়ারক্র্যাফ্‌টের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বায়োলজিক্যাল ক্লক্ পরাভূত হয়েছে। আধুনিক জেট্ বিমানের গতির সঙ্গে সেটা আর মানিয়ে চলতে পারে না। কোন যাত্রী যাচ্ছে জেট্ বিমানে চড়ে। আরোহী তখন নিজে কয়েক ঘণ্টা কাজকর্মের স্থানীয় প্রাত্যহিক ছন্দের বাইরে পড়ে যায়। এই অবস্থাতে সে একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগতে পারে, শরীরে কিছুটা ক্লান্তি আসতে পারে। মেজাজ খোশ থাকে না। কয়েকদিনের বা এক সপ্তাহের একটা ছোটখাটো যাত্রায় কিছু কিছু যাত্রী শরীরকে কখনও মানিয়ে নিতে পারে না। এবিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। জানা গিয়েছে, মানুষের ওই সব অনুভূতির ব্যাপার খুবই খাঁটি। অনেকটা সময়কে দ্রুতগতিতে পেছনে রেখে এগিয়ে গেলে শারীরিক আর মানসিক ক্রিয়াকলাপে কিছু পরিমাণ পরিবর্তন আসবেই।

একদল ভলান্টিয়ারকে বিমানে চড়িয়ে আমেরিকা থেকে ম্যানিলায় পাঠানো হয়েছিল। দশ ঘণ্টার তফাৎ। ম্যানিলায় পৌঁছনোর চব্বিশ ঘণ্টা পরেও তাদের একজনেরও সামান্য একটা যোগের অঙ্ক নির্ভুল করতে পারার মতো মনঃসংযোগ ছিল না।

জেট্ বিমানে চড়ে অনেক টাইমজোন্ অতিক্রম করার পর অধিকাংশ আরোহীর মানসিক তৎপরতা ফিরে পেতে অন্তত 24 ঘণ্টা সময় দরকার হয়। মানুষের দৈহিক তাপের আবর্তনকাল 'নতুন' সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না আরও বেশি কিছু দিন। ওই কারণে ডাক্তাররা অভিমত দিয়ে থাকেন, যারা ডে-সিফট থেকে নাইট সিফটে কাজের সময়টা বদল করেন, সেটা কয়েক সপ্তাহ অন্তর অন্তর করা উচিত। তাদের দেহ ওইভাবে বায়োলজিক্যাল ক্লককে পুনর্বিন্যাস করার নিরলস চেষ্টা থেকে তা হলে মুক্ত থাকবে। ফলে সুস্থ থাকবে শরীরমনের স্বাস্থ্যও।

165/6 ধর্মতলা রোড, হাওড়া-6

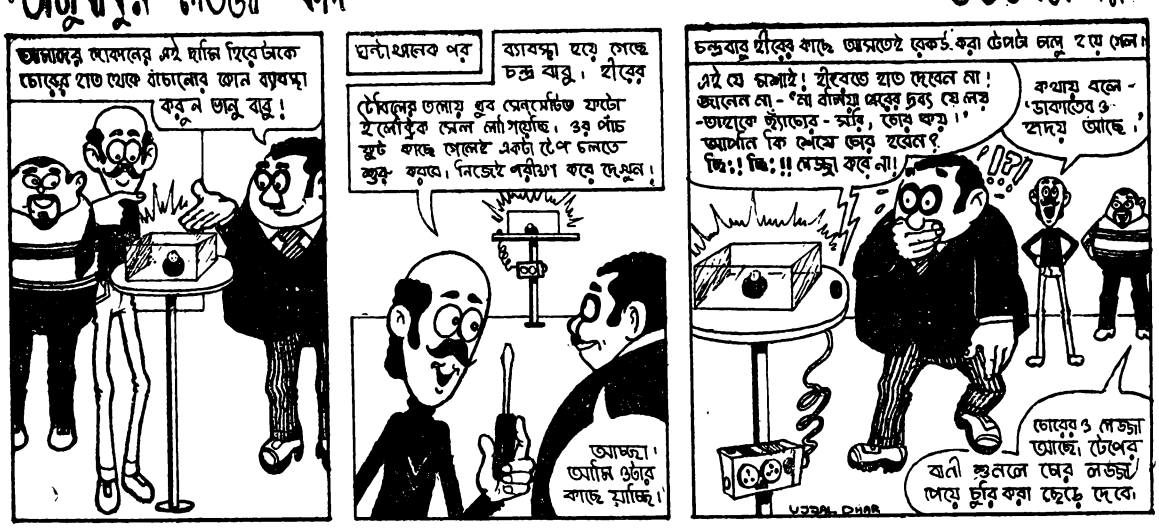

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁধানো রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটছিলেন সুশান্ত ও সতীনাথবাবু। সূর্য তখনও ডোবে নি। এমন সময় মনে হলো, উলটো দিক থেকে একজন লোক এগিয়ে আসছেন। কাছাকাছি আসতে চেনা গেল তিনি ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার মিস্টার ত্রিবেদী। সুশান্তকে নিয়ে সতীনাথ বাবু তার বন্ধু সরযূ-প্রসাদের বাড়ি দেখতে এলেন। সেখান থেকে পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন।

॥ তেরো ॥

পুলিশের বড়কর্তার হাতে কাগজের প্যাকেটটি দিয়ে সতীনাথ বাবুর মনে পড়ল তিনি ছোটকর্তার সঙ্গে আর একবার দেখা করবেন কথা দিয়ে এসেছিলেন। এবার সেটাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। ছোটকর্তা কাজের লোক, বড়কর্তার মতো আজেবাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে চান না কখনও, তাই চট্‌পট্ কাজটা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

টেবিলের ওপর নীচু হয়ে ছোটকর্তা কি যেন কাগজ-পত্র দেখছিলেন। সতীনাথ বাবু দরজায় দাঁড়িয়ে 'আসতে পারি?' বলতেই তিনি কেমন একটু চমকে উঠলেন। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, কারণ তাঁর গাম্ভীর্যের কথা এখানকার সবাই জানে। ছোটখাট ব্যাপারে বিচলিত হওয়া তাঁর ধাতে লেখে নি। সতীনাথ বাবুকে দেখে অবশ্য পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। বললেন, "আপনি! আসুন আসুন। কাল রাত্রেই চলে যাবার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ, তাই তো ঠিক ছিল। কিন্তু বেরোবার আগে হঠাৎ একটু পৈটিক গোলমাল দেখা দিল। ভাবলাম, ট্রেনে যাব, পথে আবার কি ফ্যাসাদে পড়ব শরীর খারাপ হলে। তার চেয়ে না হয় দু'-একটা দিন থেকেই যাই। বরঞ্চ একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া, যদি শরীর ভাল বোধ করি, তা হলে ইতিমধ্যে এখানে হয়তো কিছু কাজকর্ম এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।"

"তা শরীর ভালো হয়ে গেছে?"—ছোটকর্তা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন, চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন।

"আশ্চর্য! হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এত গুণ জানতাম না কখনও। ঠাট্টাই করে এসেছি বরাবর। এবার উপয়ান্তর না দেখে এক ফোঁটা খেয়ে ফেললাম। আর ঐ এক ফোঁটা পেটে পড়তেই দিব্যি কাজ দিয়েছে। সকালে উঠে দেখি শরীর একদম চাঙ্গা। তাই সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়েছি। তা আপনাদের তরফ থেকে হদিশ মিলল? মানে, আমি ঐ ব্যাঙ্কের ব্যাপারটার কথা বলছি।"

"কোথায় আর মিলল? এখনও অগাধ জলে।" ছোট-কর্তা মুখটা তুলে ঈষৎ বিকৃত করে কথা কয়টি বলে আবার সামনের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

সতীনাথ বাবুও মুখের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বললেন, "তাই তো, এর মধ্যে কাজ আর একটু এগুনো দরকার ছিল। আচ্ছা সেই লোকটি, ঐ যে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে যাঁর খুব মাখামাখি ছিল কি নাম যেন? হ্যাঁ, সরযূপ্রসাদ। তিনি থাকলে হয়তো একটু সাহায্য করতে পারতেন। তা তিনিও তো ঐ দিন থেকেই কোথায় চলে গেছেন কোন্ বিদেশে। এখনও ফেরেন নি।"

"না ফেরেন নি।" ছোটকর্তা এবার মুখ তুললেন। "সে খবর আমরাও জেনেছি, তবে তিনি থাকলেই কি আর এ ব্যাপারে কিছু করতে পারতেন? উঁহুঃ, দিল্‌দরিয়া লোক, বাপের অগাধ টাকা। আজ এখানে যাচ্ছেন, কাল ওখানে। ওঁকে দিয়ে কিছু হ'ত না।"

"না। তবে শুনেছি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে – তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর বিপদ্ দেখে হয়তো সাহায্য করতে পারতেন, বিশেষত যখন এ অঞ্চলে তাঁর বেশ প্রতিপত্তিও আছে শুনতে পাচ্ছি।

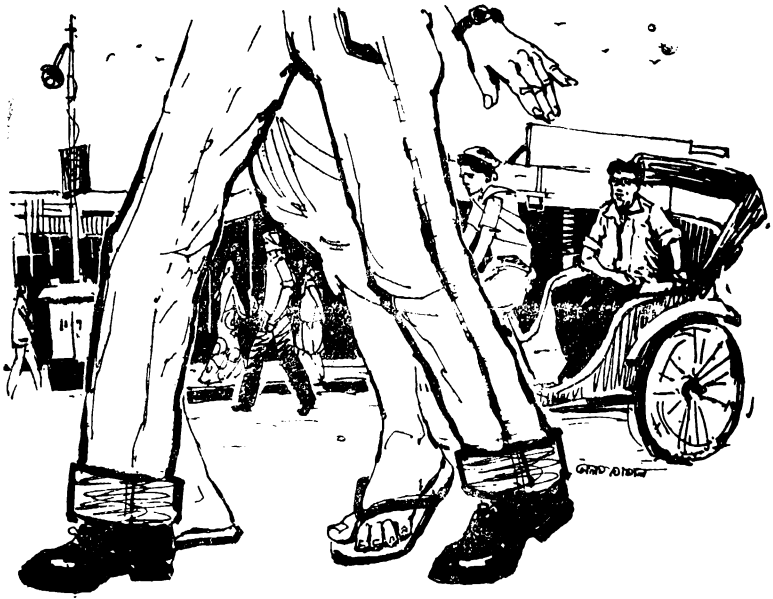

লোকটিকে চিনবার চেষ্টা করলেন, চিনতে পারলেনও

ছোটকর্তা এবার পুলিশসুলভ রুক্ষ দৃষ্টিতে একবার সতীনাথবাবুর দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন, "কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়। মনে হচ্ছে আপনার ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার সুশান্ত বাবুর প্রতি একটু দুর্বলতা আছে। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে একটু ব্যস্তও হয়েছেন। কিন্তু এটা তো আপনার কাছে আমরা আশা করি নি। আমরা সত্য ব্যাপারটাই খুঁজে বার করব এবং নিরপেক্ষভাবেই করব। আগে থাকতেই কাউকে নির্দোষ ধরে নিলে কাজ যে এগুতে পারে না তা তো আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের অজানা থাকার কথা নয়! খুলে বলতে আমার দোষ নেই, সুশান্ত বাবুকে আমরা রীতিমত সন্দেহ করি। তাই তো তাঁকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হয় নি, কতকটা নজর-বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁকে দস্তুরমত থানায় এসে একবার করে রোজ হাজিরা দিয়ে যেতে হয় যাতে বোঝা যায় তিনি পালান নি।"

সতীনাথ বাবু একটু অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললেন, "না না কারও প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই, শুধু কেবল সন্দেহের বশে কোন নিরীহ ব্যক্তির ওপর অযথা নির্যাতন না হয় এইটুকুই দেখা। নইলে আমরা, ডিটেক্‌টিভরা, সকলকেই সন্দেহ করি। এমন কি সময় সময় পুলিশকেও।"

"তার মানে?"

"তার মানে তো আপনি জানেন। সময় সময় ওঁরাও দোষীকে সাহায্য করেছেন এমন কেস্ কি আপনি কখনও শোনেন নি? কাগজেও পড়েন নি? তবে এখানকার কথা স্বতন্ত্র, বিশেষ করে এই আপনার মত দক্ষ, সৎ অফিসার কোথায় পাওয়া যাবে? শুধু কবিতা লিখে কি পুলিশের কাজ করা যায়, না সম্ভব?"

ছোটকর্তা, এবার মনে হল, একটু খুশি হয়েছেন। মৃদু হেসে বললেন, "ঠিক বলেছেন। আমি শুধু বুঝি কাজ। ব্যাস্ আর কিচ্ছু নেই!"

"সেজন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে ছুটে আসি, আচ্ছা, নতুন কোন খবর বোধ হয় তা হলে আর কিছু নেই।"

ছোটকর্তা নেতিবাচকভাবে ঘাড় নেড়ে হঠাৎ ফের কর্মব্যস্ত হয়ে কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। সতীনাথ বাবুও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন।

সুশান্ত হয়তো তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। একটা রিক্সা নিয়ে আপাতত বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সাইন-বোর্ড, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা এ, আই, সি, পি, ব্যাঙ্ক লিমিটেড। ওঃ, এই তো সেই ব্যাঙ্কটা। মিঃ ত্রিবেদী নিশ্চয়ই এতক্ষণে এসে গেছেন। ওঁকে আর একবার বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়?

রিক্সা ছেড়ে দিলেন সতীনাথ বাবু। অ্যাটাচি কেস্‌টা খুলে সামান্য একটু মেক্ আপ্-এই চেহারা বদলে গেল। মিঃ ত্রিবেদীর ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলবার জন্য যেমনটি চেহারা করেছিলেন ঠিক সেইরকম। কাল বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়ার সময়েও সেই চেহারাই ছিল তাঁর,

যার জন্যে মিঃ ত্রিবেদীর তাঁকে চিনতে ভুল হয় নি। থানায় কিন্তু তাঁর চেহারা ছিল অন্যরকম। স্বাভাবিক যা তাই, ধীর পায়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

স্লিপ্ পাঠাতেই ডাক এল। মিঃ ত্রিবেদী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন—"হাউ গ্ল্যাড্ টু মীট্ ইউ অ্যাগেইন্। ব্যাপার কি?"

"কিছু না। এখান দিয়ে যাচ্ছি। হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। হঠাৎ ব্যাঙ্কের পেল্লায় ঐ সাইন-বোর্ডটা চোখে পড়ল। ভাবলাম একটু ঢুঁ মেরে যাই। বিরক্ত করলাম বোধ হয়?"

"নট্ অ্যাট্ অল্, নট্ অ্যাট্ অল্। এখন ডাল সীজন। কাজ-কারবার কম। বলতে গেলে সময় কাটানোই প্রবলেম। তা সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"সরযূপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছিলাম। ভারি নাকি দিলদরিয়া লোক। তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেখা হলো না। সেই যে ক্যানাডা না শিকাগো না কামস্কট্‌কা কোথায় গিয়ে বসে আছেন, ফিরবার নাম নেই।"

মিঃ ত্রিবেদীর মুখে একবার একটু হাসি ফুটে উঠল। —"তা হলে একবার কামস্কট্‌কাই ঘুরে আসুন না। দ্যাট্ উইল বি এ ফাইন জার্নি। তবে ওঁকে তো চেনেন না দেখছি, দেখেনও নি কোন দিন। তবে এত আগ্রহ?"

"আজ্ঞে না, চিনি না। চোখে দেখার সৌভাগ্যও হয় নি কখনও। কিন্তু এখানে ওঁর কথা অনেক শুনেছি। শুনেছি খুব জমাটি লোক। তাই ভাবলাম একটু আলাপ করেই না হয় আসি। দিলখুশ লোকদের আমার বড় ভালো লাগে। এই যেমন আপনি!" বলে সতীনাথ বাবু ত্রিবেদীর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

মিঃ ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন, "কি নাম বললেন? সরযূপ্রসাদ? দাঁড়ান দাঁড়ান, মনে হচ্ছে আমিও দেখেছি। একটা গাল জুড়ে মস্ত একটা লাল ছোপ—সেই জন্ম থেকে। ওটা আর এ জীবনে যাবে না। ঐটে দেখলেই চেনা যায়। ভারি মজার লোক, অ্যাণ্ড্ হি হ্যাজ্ অ্যান্ অ্যাকাউণ্ট হিয়ার। মাঝে মাঝে আসতেন, গল্পও করতেন। তাই তো, বাইরে গেছেন? মাই গড্! তাই অনেকদিন দেখি নি মনে হচ্ছে!"

হঠাৎ সতীনাথ বাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাঃ, বেলা হয়ে যাচ্ছে! হাজার হোক, কাজ না থাকলেও আপনি কাজের মানুষ। এসময়ে এভাবে আপনার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।"

মিঃ ত্রিবেদী উত্তরে বললেন, "নীড নট ওয়রি। আয়্যাম্ অল্‌ওয়েজ ইওর ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।"

সতীনাথবাবু আবার হেসে ফেললেন। বললেন, "ও বিনয়টা এখন এদেশ থেকে উঠে গেছে। ওটা ওদেশে চলে। আপনি আজও ছাড়তে পারেন নি দেখছি! বোধ হয় বহুদিনের অভ্যাস। যাক, আজ চলি। আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। বাই বাই।"

স্প্রিং-ডোর ঠেলে এবার সত্যি বেরিয়ে এলেন তিনি।

দুপুরে খেয়ে নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়লেন সতীনাথ বাবু। খাওয়াটা অবশ্য বেশ দেরীতেই হলো। সুশান্তর লোকটি অতিথি আপ্যায়নে দেখা গেল বেশ তৎপর।

এবার আবার সেই পুলিশের বড়কর্তার কাছে।

বড়কর্তা আপিস ঘরেই বসেছিলেন। গুন্ গুন্ করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে টেবিলে রাখা ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন তিনি। সতীনাথ বাবুকে দেখেই খুশি-খুশি মুখে বসতে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। খুশি হবার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। অনেক দিন পরে তিনি স্বরচিত কবিতার একজন খাঁটি সমঝদার পেয়েছেন, যে লোকটি হিন্দীভাষী না হয়েও তাঁর কবিতার অকুণ্ঠ অনুরাগী বলে তাঁর মনে হয়েছে।

সতীনাথবাবু, বলা বাহুল্য, এবেলা আর তাঁর কবিতা শুনবার জন্যে আসেন নি। কাজেই তাঁকে অন্য কথা পাড়বার অবসর না দিয়ে গোড়াতেই নিজে কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, "আচ্ছা, সেই প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিলাম আর একটা ফিঙ্গার প্রিণ্ট খুব তাড়াতাড়ি করিয়ে দেবার জন্যে। সেটার কিছু হয়েছে কি?"

বড়কর্তা সহাস্যে বললেন, "হয়েছে বৈ কি! আপনার কথামত তক্ষুণি করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আর সব কাজ ফেলে ঐটে আগে করে দেবার জন্যে। এই তো একটু আগে দিয়ে গেল," বলে ড্রয়ার খুলে একটা বড় খাম থেকে একটা ফটোপ্রিণ্ট বার করে সতীনাথবাবুর সামনে তুলে ধরলেন।

সতীনাথ বাবু খানিকক্ষণ সেটির দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, "হুঁ" এটা নিয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে ছাপটা একটু চেনা-চেনা। মিলিয়ে দেখব একবার। আজ উঠি, একটু তাড়া আছে।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি। —"ভালো কথা, আমাদের এখানকার ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার—কি নাম যেন? হ্যাঁ, মিঃ ত্রিবেদী—উনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন? এখন তো আর ব্যাঙ্কে

ওঁকে পাব না। একটু বিশেষ দরকার ছিল দেখা করার। ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা আপনি বলতে পারবেন? আপনাদের কাছে তো কত লোকেরই ঠিকানা নোট করা থাকে।'

"তা থাকে। দেখি আছে কিনা।" বলে বড়কর্তা ড্রয়ার খুলে একটা মোটা নোট্‌বুক খুলে লাইনের পর লাইন আঙুল বুলিয়ে দেখে যেতে লাগলেন। একটু পরেই বলে উঠলেন, "ব্যস্, মিল্ গিয়া! চক্ বাজারের পেছন দিক্ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা নদী পর্যন্ত। পাড়াটা বেশ ছিম্‌ছাম্। ঐখানেই একেবারে শেষ দিকের একটা বাড়ি। বোধ হয় একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই খুঁজে পাবেন।" তারপর কি ভেবে, যেন হঠাৎ মনে পড়ল্, বললেন, "আরে, আমাদের ছোটকর্তার সঙ্গেও তো তাঁর ভারি খাতির! ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেও উনি সঠিক বলে দিতে পারবেন।"

"আবার কেন ব্যস্ত লোককে বিরক্ত করা? এইতেই হবে। ধন্যবাদ"বলে সতীনাথবাবু নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রিক্সায় উঠবার আগে মুখের মেক্-আপ্‌টা আবার একটু বদলে নিলেন তিনি। বেশি কিছু না, শুধু থুতনির কাছে ছোট্ট এক চিমটে কাঁচা-পাকা দাড়ি বসিয়ে দিতেই চেহারাটা অনেকটা বদলে গেল।

কোথায় যাবেন? এখনই বাড়ি ফিরবেন? না, বুকপকেটে ফিঙ্গার প্রিন্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। এবার গোয়েন্দা সতীনাথ রায়কে বিজ্ঞানী সতীনাথ রায়ে নিয়ে যাবার পালা। কিন্তু তার আগে?

সরযূপ্রসাদ কি ফিরেছেন? দুপুরের দিকে আরও একটা মেল ট্রেন এখানে এসে পৌঁছয়। খুব অল্প সময় থামলেও দূর থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের পক্ষে এটাই খুব সুবিধাজনক। আর একবার খোঁজ করে যাবেনন াকি সরযূপ্রসাদের? রিক্সা-ওয়ালাকে সেই পথেই যেতে বলে বলে দিলেন তিনি।

সরযূপ্রসাদের বাড়িতে কিন্তু তিনি আর নামলেন না। শুধু বড্ড ঝাঁকি লাগছে জানিয়ে রিক্সাটাকে একটু আস্তে আস্তে চালাতে বললেন। রিক্সা সরযূপ্রসাদের দরজার ধার দিয়ে ধার গতিতে এগিয়ে চলল। আর সেই সময় সতীনাথবাবু লক্ষ্য করলেন, সরযূপ্রসাদের দরজার ভিতর থেকে সাহেবী পোশাকপরা কে একজন বেরিয়ে আসছেন।

সতীনাথ বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটিকে চিনবার চেষ্টা করলেন, চিনতে পারলেনও। কিন্তু তাঁর থুতনির নিচের কাঁচা-পাকা দাড়ি আর সাদাটে ভ্রূ দেখে লোকটি যে তাঁকে চিনতে পারেন নি সেবিষয়ে তাঁর মোটেই সন্দেহ ছিল না।

(ক্রমশঃ)

16 টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-25

তোমরা কি জানো?

তোমাদের জন্য তিনটে বাঘা বাঘা বই আমরা প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো:

আবিষ্কারের পিছনে ১৬৲

ডাঃ মনীশ প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন সমরজিৎ কর

তোমরা তো জানো, অসুখ করলে আমরা ওষুধ খাই, ইনজেকশন নিয়ে থাকি, কিন্তু কি ভাবে এতসব আবিষ্কার হলো তা হয়তো জানো না, ডাক্তারী শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের নানান কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক—যা কিন্তু গল্প নয় মোটেই, সত্যি। সোজা কথায় তোমাদের জন্য অসাধারণ একটি বই।

আমাদের দু নম্বর বইটি হলো

বিজ্ঞানের হরেকরকম ৭৲

অনীশ দেব

এতে আছে: মাপ কি করে এলো, পশুপক্ষীর শরীরে তাপ কিভাবে তৈরী হয়, বুদ্ধি কি করে মাপে, পৃথিবী কেমন দেখতে বা টিভিতে যা দেখা যায় না, এসব আশ্চর্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা। এগুলো নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রতি পাতায় মজার মজার ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক নিজেই।

তিন নম্বর বইটিও কিন্তু প্রথম দুটোর চেয়ে কম নয়! এতে আছে ঘড়ি ও সময় মাপা নিয়ে নানান অজানা কথা

ঘড়ি নিয়ে রূপকথা ৭৲

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আদিম মানুষ কি করে সময় মাপতে শিখলো, কি ভাবে আবিষ্কার হলো ছায়াঘড়ি, সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি। এছাড়া ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পারমাণবিক ঘড়ি তো আছেই। সব মিলিয়ে এ এক মজার বই। সঙ্গে অনেক ছবি ও দুটো ফটোগ্রাফ।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

যে যে বইটা হাতে পেতে চাও পাঁচ টাকা অগ্রিম সহ নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ড পাঠাও। তাহলে ঘরে বসেই পেয়ে যাবে।

স্বপ্নদীপ ॥ ৭ই শীতলা লেন, কলকাতা-৫

সীমান্তের গ্রহ ঃ নেপচুন ও প্লুটো

বিমান বসু

1781 সালে ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমেই গ্রহটির কক্ষপথ গণনার কাজে মন দিলেন। প্রায় 40 বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর 1821 সালে ফ্রান্সের গণিতবিদ্ অ্যালেক্সি বোভার্ড নতুন গ্রহটির গতিবিধিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে, ইউরেনাসের চলার পথ অংকের হিসেব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত তা নয়, একটু যেন গরমিল রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সময় ঐ গরমিলের কারণটা কি তা কারো মাথায় আসে নি। এর সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আরও 24 বছর পরে 1845 সালে।

সমাধানটা খুঁজে পান দুজন গণিতবিদ্—একজন ইংলণ্ডের অধিবাসী, নাম জন অ্যাডামস্। অপরজন ফ্রান্সের অধিবাসী, নাম আরবেইন লিভেরিয়ার। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, ঐ দুজন একে অপরের অজান্তেই প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা বললেন, ইউরেনাসের বাইরে কক্ষপথে কোনও অজ্ঞাত গ্রহ আছে যার টান ইউরেনাসের চলনে গোলমাল ঘটাচ্ছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে সৌরমণ্ডলের প্রত্যেকটি গ্রহ বাকি প্রত্যেকটি গ্রহকে টানে। ঐ টানের পরিমাণ নির্ভর করে গ্রহদের নিজস্ব ভর এবং তাদের মধ্যেকার দূরত্বের ওপর। এর ফলে যে কোনও গ্রহের চলন অনেকটা নির্ভর করে ঐ গ্রহটির ওপর বাকি গ্রহগুলির সমষ্টিগত টানের ওপর। এই সূত্র অনুসারে ইউরেনাসের বেলায় সবচেয়ে বেশি টান পড়া উচিত বৃহস্পতির ও শনির। আসলে কিন্তু দেখা গেল যে তা নয়, ইউরেনাসের ওপর আরও কোনও একটা টান এসে পড়ছে যার ফলে এর গতিপথ অংকের হিসেবে যা হওয়া উচিত তা না হয়ে যেন একটু সরে যাচ্ছে।

অ্যাডামস্ ও লিভেরিয়ার দুজনেই ছিলেন গণিতবিদ্। তাঁরা অংক কষে নতুন গ্রহটির সন্ধান পেলেও বাস্তবে গ্রহটিকে তাঁরা কেউই দেখেন নি। ইউরেনাসকে প্রথম দেখবার কৃতিত্ব জার্মানীর বার্লিন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোহান গ্যালীর।

1845 সালের নভেম্বর মাসে অ্যাডামস্ তাঁর নতুন গ্রহটি সংক্রান্ত গণনার ফলাফল ইংলণ্ডের রাজজ্যোতির্বিদ্ স্যার জর্জ অ্যারিকে পাঠিয়ে তাঁকে গ্রহটিকে খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানান। অ্যারি কিন্তু নিজে কিছুই করেন না। তিনি কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জেমস চ্যালিস্‌কে ঐ অনুসন্ধানের ভার দেন। চ্যালিস নাকি গ্রহটি খুঁজে পান না।

ওদিকে প্রায় একই সময়, লিভেরিয়ারও তাঁর গণনার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন বার্লিনে যোহান গ্যালীর কাছে। কাগজপত্র গ্যালীর কাছে পৌঁছয় 1846 সালের 23 সেপ্টেম্বরে। সেদিন রাত্তিরেই গ্যালী তাঁর দূরবীনে লিভেরিয়ারের হিসেবমত নির্দিষ্ট জায়গাতেই অজ্ঞাত গ্রহটিকে দেখতে পেলেন। নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হলো নেপচুন।

নেপচুনের আসল আবিষ্কারক কে তা নিয়ে এক সময় যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। তবে এখন এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, এই সাফল্যে অ্যাডামস্ ও লিভেরিয়ার দুজনেরই কৃতিত্ব সমান। তবে আকাশে নেপচুনকে প্রথম খুঁজে বের করার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গ্যালীর প্রাপ্য।

সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব প্রায় 450 কোটি কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে প্রায় 165 বছর।

গ্রহ হিসেবে নেপচুন বেশ বড়, প্রায় ইউরেনাসেরই সমান। এর ব্যাস প্রায় 49,500 কিলোমিটার (ইউরেনাসের ব্যাস 51,800 কিলোমিটার)। আয়তনে নেপচুন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 54 গুণ বড়, কিন্তু হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী বলে এর ঘনত্ব খুবই কম, মাত্র 1·8। আর সেজন্যে পৃথিবীর তুলনায় নেপচুনের ভর মাত্র 17 গুণ বেশি।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহটির গঠন সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় নেপচুনের গঠনও ইউরেনাসের মতোই। দুটি গ্রহই জমাটবাঁধা গ্যাসের তৈরী। ইউরেনাসের মতো নেপচুনের বায়ুমণ্ডলেও প্রচুর পরিমাণে মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর ইউরেনাসের মতো নেপচুনের উপরিতলও খুবই ঠাণ্ডা।

সেখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যের 165 ডিগ্রী সেলসিয়স নিচে।

দূরবীনে নেপচুনকেও ইউরেনাসের মতো হাল্কা সবুজ রঙের বৈশিষ্ট্যহীন গোলকের মতো দেখায়। আর সেজন্যেই গ্রহটির আহ্নিক গতির সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আজও পাওয়া যায় নি। আগে মনে করা হত নেপচুন নিজের অক্ষে একবার ঘোরে 15 ঘণ্টা 48 মিনিটে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে নেপচুনের সময় লাগে অনেক বেশি, হয়তো 23 বা 24 ঘণ্টাও হতে পারে।

আজ পর্যন্ত নেপচুনের দুটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় উপগ্রহটির নাম ট্রাইটন, ব্যাস 3700 কিলোমিটার। উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়ম ল্যাসেল 1846 সালে, নেপচুনের আবিষ্কারের মাত্র 17 দিনের মধ্যে। নেপচুন থেকে ট্রাইটনের দূরত্ব প্রায় 3,55,000 কিলোমিটার। এই উপগ্রহটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি সাধারণ উপগ্রহ-গুলির মতো মূল গ্রহটি যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘোরে না, ঘোরে উল্টো মুখে। মানে, নেপচুনের চারপাশে ট্রাইটন ঘোরে পূব থেকে পশ্চিমে।

নেপচুনের দ্বিতীয় উপগ্রহটি খুবই ছোট, নাম নিরিইদ। এর ব্যাস মাত্র 300 কিলোমিটার। এটি আবিষ্কার করেন আমেরিকার জি পি কুইপার 1849 সালে। নেপচুন থেকে নিরিইদের গড় দূরত্ব হলো প্রায় 56 লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এর কক্ষপথ ভীষণ রকমের উপবৃত্তাকার হওয়ার ফলে উপগ্রহটি কখনো চলে আসে গ্রহ থেকে মাত্র 13 লক্ষ 40 হাজার কিলোমিটারের মধ্যে, আবার কখনো চলে যায় গ্রহ থেকে প্রায় 98 লক্ষ কিলোমিটার দূরে।

সম্প্রতি নেপচুনেরও নিজস্ব দুটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সন্ধান পান আমেরিকার ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড্‌ওয়ার্ড গিনান, 1968 সালে সংগ্রহ করা কিছু পুরানো তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। সেবছর একটি তারার সামনে দিয়ে নেপচুনের পরিক্রমণের সময় ঐ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এখানেও ব্যাপারটা ঠিক 1977 সালে ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কারের মতো।

নেপচুনের বলয় দুটির ব্যাস অনুমান করা হয়েছে যথাক্রমে 56,000 কিলোমিটার ও 65,000 কিলোমিটার। বলয় দুটি চওড়ায় সম্ভবতঃ 2000 থেকে 2500 কিলোমিটারের মতো। তবে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৃথিবীর থেকে পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আগামী 1989 সালের শেষের দিকে ভয়েজার-2 গ্রহযানটির নেপচুনের কাছাকাছি পৌঁছবার কথা আছে। সেসময় নেপচুনের গঠন ও তার বায়ুমণ্ডল, তার উপগ্রহ ও বলয় সম্পর্কে অনেক তথ্য হয়তো আমরা পাবো।

প্লুটো

নেপচুনের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা এবার সবকটি গ্রহের গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। আসলে কিন্তু তা হলো না। দেখা গেল যে, সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের গ্রহগুলির চলাফেরায় কিছু গরমিল থেকে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হলো, হয়তো নেপচুনের বাইরেও কোনও অজ্ঞাত গ্রহ আছে যার টানের ফলেই ঐ গরমিল রয়ে যাচ্ছে। শুরু হলো খোঁজ।

1915 সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল অজ্ঞাত গ্রহটি কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে সে বিষয় তথ্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেসময় অনেক শক্তি-শালী দূরবীনেও গ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তার সন্ধান পাওয়া যায় লোয়েলের মৃত্যুর 14 বছর পরে 1930 সালে। সেবছর ফেব্রুয়ারি মাসের 18 তারিখে লোয়েল মানমন্দির থেকে তোলা ছবিতে গ্রহটিকে খুঁজে বের করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ। নতুন গ্রহটির আবিষ্কার ঘোষণা করা হয় 13 মার্চ, নাম রাখা হয় প্লুটো।

সূর্য থেকে প্লুটোর গড় দূরত্ব প্রায় 590 কোটি কিলো-মিটার। কিন্তু আসলে এই দূরত্বে যথেষ্ট কমবেশি হয়, কারণ প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশি উপবৃত্তাকার। যেমন ধরো, যখন প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় প্রায় 443 কোটি কিলো-মিটার। আবার যখন সে সবচেয়ে দূরে চলে যায় তখন দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 740 কোটি কিলোমিটার। এর ফলে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ বলে ধরা হয়। কথাটা কিন্তু একে-বারে ঠিক নয়, কারণ প্লুটো যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে তখন সে নেপচুনের কক্ষপথেও ভেতরে চলে আসে। ফলে সে তখন আর সবচেয়ে বাইরের গ্রহ থাকে না।

গত 1979 সালের জানুয়ারী মাসে ঠিক এমনটিই হয়েছে। প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথের ভেতরে চলে এসেছে।

আর এ অবস্থা থাকবে 1999 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। সুতরাং প্রায় 20 বছর ধরে নেপচুনই হয়ে থাকবে আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ।

দূরত্ব বেশি বলে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে প্লুটোর সময় লাগে অনেক বেশি—আমাদের হিসেবে প্রায় 248 বছর। ফলে প্লুটো হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে মন্থর গ্রহ। কক্ষপথে এর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 4·7 কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 30 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।

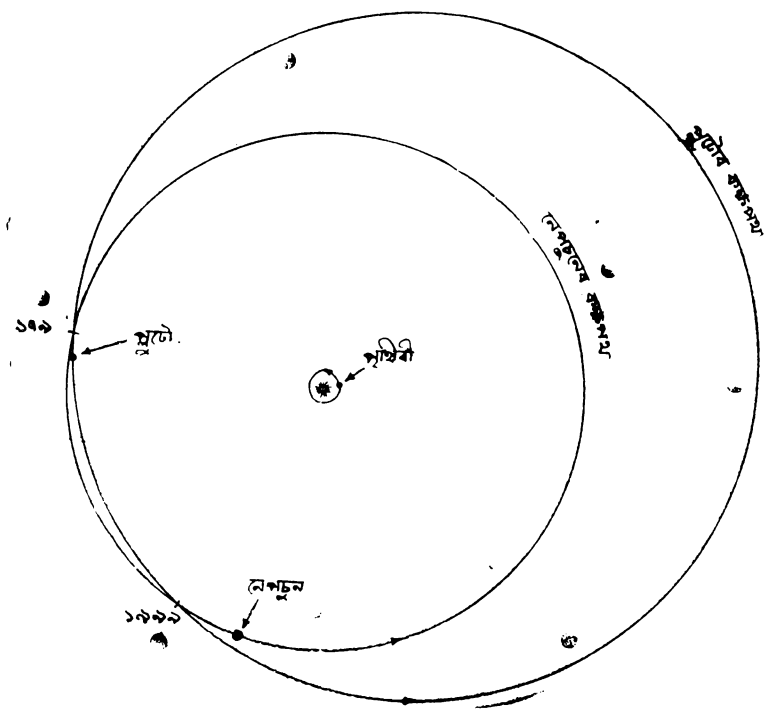

গ্রহ হিসেবে প্লুটো খুবই ছোট। সর্বাধুনিক হিসেবে গ্রহটির ব্যাস হয়তো 3000 কিলোমিটারের বেশি নয়। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বুঝতেই পারছ, অত ছোট গ্রহটিকে এত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে খুব বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়। তবে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, প্লুটোর উপরিতল জমাট বাঁধা মিথেন গ্যাসে ঢাকা। সেখানকার তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যেরও 220 ডিগ্রী সেলসিয়স নিচে।

কিছু আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে, প্লুটোর কোনও উপগ্রহ নেই। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 1978 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নৌসৈনিক মান-মন্দির থেকে তোলা ছবিতে উপগ্রহটির সন্ধান পান জে ডব্লিউ ক্রিস্টি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্লুটোর উপগ্রহটি বেশ বড়। এর ব্যাস হয়তো 1000 থেকে 1200 কিলোমিটারের মধ্যে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্লুটোর ব্যাস যদি 3000 কিলোমিটার হয়, তবে সে তুলনায় তার উপগ্রহটি খুবই বিশাল বলতে হবে। উপগ্রহটির কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার, ব্যাস প্রায় 40,000 কিলোমিটার।

প্লুটোর আকার ও গঠন দেখে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্লুটো আসলে কোনও গ্রহ নয় বরং নেপচুনের কোনও কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল-এর ধারণা—প্লুটো ও ট্রাইটন এক সময় নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, কিন্তু কোনও কারণে তারা নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসে। ট্রাইটন নেপচুনের উপগ্রহই রয়ে যায়, কিন্তু তার চলনের দিক পরিবর্তন হয়ে যায়। প্লুটো বেরিয়ে গিয়ে সূর্যের গ্রহ হয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই আজও প্লুটোর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথের ভেতরে চলে আসে।

প্লুটোর পর তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে, সৌরমণ্ডলে কি আর কোনও গ্রহ আছে? প্রশ্নের উত্তর হয়তো সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আজ যা অজানা রয়েছে ভবিষ্যতে হয়তো তার সন্ধান মিলতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সৌরমণ্ডলে সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় প্লুটোর বাইরে আর কোনও গ্রহ নেই। তবে গত দশকে দু' একবার এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে 1972 সালে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ্ যোসেফ ব্র্যাডি এবং এড্না কার্পেণ্টার বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতুর গতিবিধি সম্পর্কে গণনা করতে গিয়ে দেখলেন যে, তার মধ্যে কিছু গরমিল্ দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, প্লুটোর বাইরে নিশ্চয়ই কোনও গ্রহ আছে যার টানের ফলে ঐ গরমিল হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাত গ্রহটির নাম রাখলেন 'প্ল্যানেট্-এক্স'। ব্র্যাডি ঐ গ্রহটির সম্ভাব্য আয়তন এবং

প্রদক্ষিণ কালেরও একটা আন্দাজ দেন। তিনি জানান যে, সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহটি প্রায় বৃহস্পতির মতোই বিশাল। সূর্য থেকে প্রায় 920 কোটি কিলোমিটার দূরে কক্ষপথে এটি প্রায় 464 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্র্যাডির 'প্ল্যানেট এক্স'-এর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় বার দশম গ্রহ নিয়ে হৈচৈ হয় 1977 সালে। সে বছর অক্টোবর মাসে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস্ কোআল্ সূর্যের কক্ষপথে একটি গ্রহের মতো বস্তুর সন্ধান পান, যার নাম রাখা হয় 'চিরণ'। এটিকে প্রথমে সৌর-মণ্ডলের দশম গ্রহ বলেই অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে জানাতে পারা গেছে যে, এটি সম্ভবত ধুমকেতু বা গ্রহাণু জাতীয় বস্তু, যার আনুমানিক ব্যাস কয়েক শ কিলো-মিটার মাত্র। চিরনের কক্ষপথ গণনা করে দেখা গেছে যে, এটি একটি উপবৃত্তাকার পথে শনি ও ইউরেনাসের মাঝখানে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তবে এর কক্ষপথ স্থির নয়।

নেপচুনের উপগ্রহ

উপগ্রহ	ব্যাস	গ্রহ থেকে দূরত্ব	আবিষ্কারের তারিখ
ট্রাইটন	3700 কি. মি.	3,55,000 কি. মি.	1946
নিরিইদ	300 কি. মি:	55,00,000 কি. মি	1949

7 ইউ এফ কলেজ রোড, নয়াদিল্লী—1

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য
ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-এর সেরা বই
ডঃ অলক চক্রবর্তী, ডি. এস. সি.
ও
অমিয়তোষ রায় লিখিত
বিজ্ঞান প্রবেশিকা
তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ
[সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক অংশ সহ]
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭ * গ্রাম ঃ গ্রন্থাগার

পুনর্জীবিত উদ্ভিদ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

উদ্ভিদজগতে এমন কয়েকটি প্রজাতি আছে যাদের আচরণ বড় অদ্ভুত। এইগুলি মৃত্যুর পরেও যেন নবজীবন প্রাপ্ত হয়। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পর যীশুখৃষ্ট যেমন পুনর্বার জীবন লাভ করে কবর থেকে উত্থিত হন, এরাও যেন সেই চরম মরে যাওয়ায় পর বেঁচে ওঠে এবং সেজন্যে এই সব উদ্ভিদের নাম দেওয়া হয়েছে 'রেসারাক্শান প্ল্যান্ট' বা পুনর্জীবিত উদ্ভিদ।

এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো একটি ছোট বর্ষজীবী উদ্ভিদ, যার বৈজ্ঞানিক নাম 'এনাস্টাটিকা।' এই গাছটি পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া ও আরব দেশের মরুভূমিতে। গাছটি নেহাৎ ছোট, 10-15 সেঃ মিঃ উঁচু, আর গাছের গোড়া থেকে কতকগুলি শাখা মাটির উপরে ছত্রাকারে ছড়িয়ে থাকে। ছোট্ট ছোট্ট পাতা আর তারই গোড়ায় গোড়ায় ছোট্ট ছোট্ট ফুল। কয়েকটি শাখা আর ছোট ছোট পাতা নিয়ে এক একটি গাছ মরুভূমির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকে। কখনও বা গোটাকতক গাছ এক জায়গায় কাছাকাছি থেকে মরুভূমির উপর এখানে সেখানে সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দেয়।

মৃতপ্রায় শুষ্ক উদ্ভিদ

এই গাছের ফুল থেকে ছোট্ট ছোট্ট ফল হলো আর ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটিও ধীরে ধীরে গতপ্রাণ হয়ে শুকিয়ে গেল। গাছটি মরে গেল বটে, কিন্তু ফলগুলি গাছেই থাকলো, ঝরে গেল না আর ফলের বীজও তার ভেতরেই থাকলো। শুষ্ক গাছটির ছড়ানো ডাল-পালাগুলি গোড়ার দিকে বেঁকে আসতে লাগলো, শেষে মৃত গাছটি একটা জটপাকানো দড়ির তালের মত হয়ে গেল। এর শিকড়গুলোও দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায় আর মরুভূমির ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কায় গাছটা উপড়ে গিয়ে জমির উপর গড়াতে থাকে। এইরকম একটা মৃত শুষ্ক উদ্ভিদ যার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে চলে এসেছে, তাতেও হঠাৎ একদিন দেখা গেল নতুন পাতা বের হয়েছে। তার জটপাকানো অবস্থার অবসান হয়ে ডাল-পালাগুলো আবার সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মৃত গাছটি আবার বেঁচে উঠলো! লোকে গাছের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে বললো 'এটা হলো রেসারাক্শান প্ল্যান্ট'।

নামকরণ তো ঠিকমতই হলো। কিন্তু গাছের এই রকম আচরণের রহস্যটা তো জানা দরকার। তাই বিশেষ ভাবে গাছটিকে পর্যবেক্ষণ করা হলো। দেখা গেল যে, গাছটির শুকনো ডালপালাগুলির জল শোষণ করার একটা ক্ষমতা আছে আর সামান্য একটু জল পেলে বা একটু আর্দ্রভাব হলেই বাঁকা ডালগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে যায়। তার জোরে ফল থেকে বীজগুলো মাটিতে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই অংকুরিত হয়ে ওঠে। শুষ্ক গাছটির চারপাশে এই সব নতুন নতুন অংকুর বের হওয়ায় মনে হয়, পুরানো মৃত গাছটিরই যেন নতুন পাতা বের হয়েছে। সুতরাং গাছটি পুনর্জীবিত হয়েছে এইরকম ভুল ধারণা হওয়াটা

পুনর্জীবিত উদ্ভিদ

মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

আরও কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, সেগুলিও পুনর্জীবিত উদ্ভিদের দলে পড়ে। এদের আচরণ ভিন্ন প্রকারের। আমাদের দেশে কিছু লোক রাস্তার ধারে টোটকা ওষুধের

জন্যে গাছের ছাল, পাতা, শিকড় প্রভৃতি বিক্রি করে। তাদের কাছে একরকম উদ্ভিদ শুষ্ক অবস্থায় পাওয়া যায়, যেটা জলে ডোবালেই আবার সতেজ ও টাটকা হয়ে যায়। এই উদ্ভিদের নাম সেলাজিনেলা। এইরকম গুণ থাকার জন্যে লোকে মনে করে, সেলাজিনেলা থেকে তৈরী ওষুধ খেলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ও মরণাপন্ন রোগী নবজীবন লাভ করে, যদিও তা ঠিক নয়। সেলাজিনেলার অনেক প্রজাতি আছে আর সবগুলিরই কমবেশি এই গুণ আছে যে আপাতদৃষ্টিতে মৃত মনে হলেও এর শাখা-প্রশাখার মধ্যে জীবনীশক্তি অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। শুকিয়ে গেলে ডালপালাগুলো গুটিয়ে যায় আবার জল পেলেই সেগুলি যে সোজা হয়ে যায় তাই নয়, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। মেক্সিকো দেশে একরকম সেলাজিনেলা পাওয়া যায় তার জীবনীশক্তি সহজে লোপ পায় না। এই গাছটিকে বারবার মাটি থেকে তুলে শুকিয়ে নিয়ে আবার ভিজে মাটিতে লাগিয়ে দিলে গাছটি নতুনভাবে বাড়তে থাকে। আর একবার মাটি থেকে তুলে শুকানো আর তারপর মাটিতে আবার পুতে দেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও বেশ কিছুদিন হতে পারে। তাতেও এর ডালপালার মধ্যে প্রাণশক্তি থাকে। তবে বার বার একটি গাছকে শুকানো আর পুনর্জীবিত করা হতে থাকলে এই প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পায় আর গাছটি একেবারেই মরে যায়। মেক্সিকোর এই গাছটির নাম সেলাজিনেলা লেপিডোফিলা।

ব্রাজিলে একটি ফার্ন গাছ আছে, তারও এইরকম গুণ আছে। বহুদিন শুষ্ক অবস্থায় থাকার পরেও জল পাওয়ামাত্র পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ফার্ন গাছের নাম পলিপোডিয়াম পলিপোডিয়ডিস্।

উদ্ভিদ উদ্যান, শিবপুর, হাওড়া

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

অমর বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্ন

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

1982 সালের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্ন-এর জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল। বিজ্ঞান-অনুরাগীদের, কাছে বোর্ন একটি চিরপরিচিত নাম। আমাদের সৌভাগ্য এই অমর বিজ্ঞানী একদা ভারতে বসবাস করেছিলেন।

বোর্ন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদে ধরনের মানুষ। আস্তে ভেবে চিন্তে কথা বলতেন। লাজুক এবং মুখচোরা এই মানুষটি একান্ত সংগোপনে তাঁর সাধনা করে গেছেন।

ঠিক একশো বছর আগে জার্মানীর ব্রেসলাউ শহরে তাঁর জন্ম। ওডার নদীর ধারে এই শহরটি দেখতে খুব সুন্দর। ম্যাক্স-এর আবাল্য সঙ্গী ছিল এই ওডার নদী। ম্যাক্সের সকল চিন্তার উৎস ছিল এই নদীটি।

ম্যাক্সের বাবা গুস্তাভ বোর্ন ছিলেন বেসলাউ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ম্যাক্সের মা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, বিখ্যাত কয়েকটি কারখানার মালিকের মেয়ে। বাবা-মা দু'জনেই ম্যাক্সকে ছেলেবেলাতেই নানারকম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন।

কিন্তু বিধাতা বাধ সাধলেন! এই শান্ত, সুন্দর সংসারের উপর হলো বজ্রাঘাত। ম্যাক্সের মা মারা গেলেন।

ম্যাক্সের সবচেয়ে আপনজন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিলেন ম্যাক্স। দুঃখ আরো নিবিড়তর হলো। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বসলেন।

ম্যাক্স দুঃখকে ভোলবার জন্যে দিনরাত পড়াশোনা করতে লাগলেন। অংক তাঁর প্রিয় বিষয়। অংককেই তিনি চিরসঙ্গী করে নিলেন। স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ম্যাক্স ভর্তি হলেন গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পাঠ শেষ করে অতি অল্প বয়সে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ই ম্যাক্সকে আবিষ্কারের পথ দেখালো। তাঁর আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আবিষ্কার এখান থেকে। নতুন এক বলবিদ্যার সৃষ্টি হলো। কঠিন কেলাসতলও ম্যাক্সের গবেষণার ফসল।

ম্যাক্স জাতিতে ছিলেন ইহুদী। হের হিটলার তখন জার্মানীর সর্বেসর্বা। হিটলারের বিদ্বেষের আগুন এসে লাগলো ম্যাক্সেরও গায়ে।

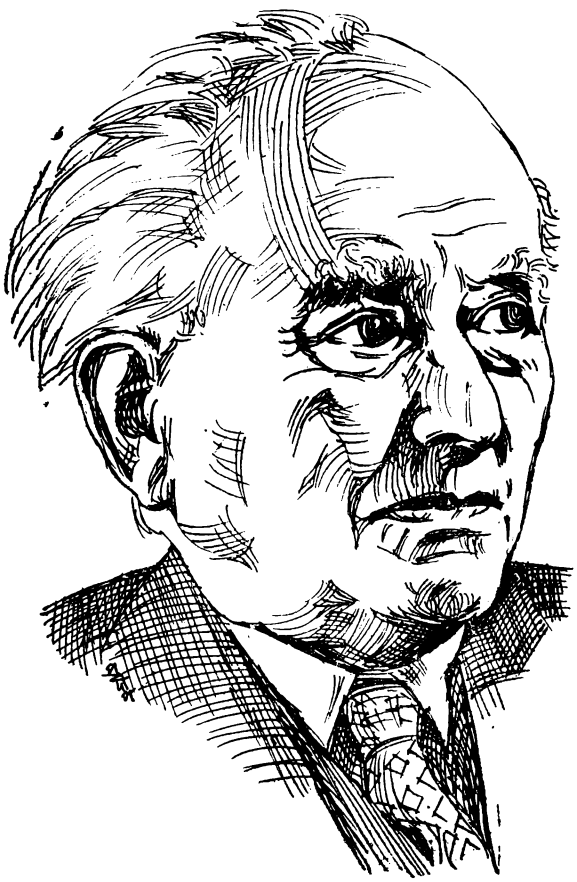

ম্যাক্স বোর্ন

ম্যাক্স পালিয়ে চলে এলেন গ্রেট ব্রিটেনে। চাকরি নেই, অর্থ নেই, সংস্থান নেই। অথচ একটা সংসার তাঁর মাথার উপর।

তার উপর আর এক দুঃসংবাদ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জন্যে সে বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো তাঁরই সহকর্মী ভার্নার হাইজেনবার্গকে।

মনের দিক থেকে ভয়ানক দমে গেলেন ম্যাক্স। তবে সমস্ত সাধনা বিফল হলো!

ম্যাক্সের দুরবস্থার কথা বিজ্ঞানীমহলে প্রচারিত হলো। ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন তাঁকে বাঙ্গালোরের ইনসটিটিউটের পরিদর্শক-বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত করে আমন্ত্রণ করলেন। ম্যাক্স সপরিবারে চলে এলেন ভারতে। ম্যাক্সের স্ত্রীর অত্যন্ত ভাল লাগলো এই দেশ। কিন্তু নানা কারণে ম্যাক্সের এদেশে থাকা হলো না। তিনি ইংলণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে চলে গেলেন। 1945 সালে ম্যাক্স বোর্ন জার্মানীর আর এক বিজ্ঞানী ওয়াল্ডার বোথের সঙ্গে যুগ্ম ভাগে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

অবসর গ্রহণ করে ম্যাক্স ফিরে এলেন নিজের দেশ জার্মানীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে ম্যাক্স যেন শোকে অধীর হয়ে উঠলেন! আইনষ্টাইন, রাসেল, বার্নার্ড শ প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে এক হয়ে সারা বিশ্বে শান্তির প্রস্তাব দিলেন। জার্মান সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন—তাঁরা যদি পরমাণু বোমা বানান কোন বিজ্ঞানী এতে সহযোগিতা করবেন না। ম্যাক্সের প্রচেষ্টা সফল হলো।

ম্যাক্স-এর চরিত্রে আর একটা সুন্দর দিক ছিল। তিনি ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। নিজের ছেলে-মেয়েদের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার জন্যে নিজের ছেলেবেলাকার ঘটনা, পুরনো দিনের জার্মানীর গল্প নানাভাবে লিখে গেছেন তাঁর ডাইরির পাতায়।

ম্যাক্স ছিলেন সংগীতপ্রিয়। তাঁর জীবনও সংগীতের মতো বিচিত্র রাগরাগিনীতে ছন্দোবদ্ধ। 1971 সালে বিজ্ঞানজগতে অনেক কিছু উপহার দিয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন অমর বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্ন।

জে. এন. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী

দাঁতের শোভা

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হাসিমুখ দেখতে ভাল। হাসতে গিয়ে যদি দাঁত দেখা যায় আর সেই দাঁত যদি অপরিষ্কার বা পোকায় খাওয়া হয়, তা হলে হাসির আকর্ষণই নষ্ট। দাঁতের যত্ন নিলে কিন্তু এই অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়তে হয় না। দাঁতের যত্ন বলতে কী বোঝায়? সাবান দিয়ে স্নান করে যেমন শরীর পরিষ্কার করা হয়, চুলে তেল দিয়ে স্নান ক'রে চিরুনী আঁচ্‌ড়ে পরিষ্কার করতে হয়, তেমনি দাঁতকেও নিত্য নিয়মিত মেজে ঘষে পরিষ্কার রাখতে হয়। স্নান যদিও বাদ দেওয়া যায়, দাঁত মাজা কিন্তু কোনদিনও বাদ দেওয়া চলবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে দাঁত পরিষ্কার করব কেন? প্রথমেই বলতে হয় পরিচ্ছন্নতার কথা। ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত দেখতে সকলেরই ভাল লাগে। শুধু হাসি নয়, মুখের সৌন্দর্যই বেড়ে যায়। এ ছাড়া দাঁত পরিষ্কার না রাখলে দাঁতে ক্ষত হতে পারে (কেরিজ)। দাঁতে ক্ষত থাকলে দেখতে বিশ্রী তো হয়ই. উপরন্তু মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হতে পারে যে মধ্যরাত্রে বেদনানাশক ওষুধের সন্ধানে ছুটতে হবে। দাঁত পরিষ্কার না রাখলে মাড়িরও ক্ষতি। জীবাণুর অনুপ্রবেশে মাড়ি ফুলে যায় এবং শেষ অবধি পাওরিয়া হতে পারে। মাটি আলগা থাকলে যেমন গাছ প'ড়ে যায়, তেমনি মাড়ির স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। এতগুলো বিপদের আশংকা যখন রয়েছে, তখন আগেভাগে দাঁতের যত্ন নেওয়া বিবেচনার কাজ নয় কী? কাজটা বেশি মেহনতেরও নয়, ব্যয়সাধ্যও নয়, শুধু খেয়াল করা।

দাঁত পরিষ্কার নিত্য এবং নিয়মিত অন্তত একবার করতে হবে। সেটা প্রাতঃকালে উঠেই সেরে ফেলা ভাল। দাঁত মাজার প্রক্রিয়া মোটামুটি সবায়েরই জানা আছে। শুধু আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ঘষলে তেমন পরিষ্কার হয় না। সেইজন্যে কোন বস্তুর দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করতে হয়, তাকে বলা হয় মাজন। মাজন গুঁড়োও হতে পারে, মলমের মতও হ'তে পারে। গুঁড়ো মাজন দিয়ে মাজলে দাঁত ভাল পরিষ্কার হয়, কিন্তু ঐ মাজন প্রকৃত মিহি হওয়া চাই। যদি মাজনে কঠিন দানা থাকে তা হলে সেগুলির ঘর্ষণে দাঁতের উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজ-কাল পেষ্টের (মলম মাজন) প্রচলনই বেশি। পেষ্টও ভাল, কিন্তু অনেকবার কুলকুচো করে ওর আঠালো ভাবটা ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন। গুঁড়ো বা পেষ্ট যাই হোক, আঙ্গুল দিয়েও মাজা যায়, ব্রাশ দিয়েও মাজা যায়। আঙ্গুলের চেয়ে ব্রাশ দিয়ে মাজা অধিক ফলপ্রদ। বেশি শক্ত ব্রাশ (হার্ড বা এক্সট্রা হার্ড) ব্যবহার না করাই ভাল। ব্রাশে দাঁতের উপরিভাগ শুধু সাফ হয় তাই নয়, দুটি দাঁতের মাঝখানে ফাঁকে ফাঁকে যে খাদ্য কণাগুলি লুকিয়ে থাকে সেগুলি ব্রাশ ছাড়া ভালভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ব্রাশ দিয়ে মাজারও কৌশল আছে, যেমন তেমন করে ব্রাশ ব্যবহার করলে চলবে না। ব্রাশে খানিকটা মাজন লাগিয়ে আস্তে আস্তে উপরনিচ করে ঘষতে হবে, অল্প চাপ দিয়ে। ব্রাশের মুখ্য কাজ দু'-দাঁতের মাঝখান সাফ করা। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আঙ্গুল দিয়ে মাড়ি ঘষে দিতে হবে। সব মাজনেরই একই উপকারিতা। কোন মাজনেরই বিশেষ উৎকর্ষ নেই। বরঞ্চ মাঝে মাঝে মাজন বদল করা ফলপ্রসূ। দাঁতন ব্যবহার করাও ভাল। নিম, আশনেওড়া, পেয়ারার ডাল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ঘর্ষণ ছাড়া উদ্ভিজ্জ রসের উপকারটুকু পাওয়া যায় এবং দাঁতও পরিষ্কার হয়। দাঁতের ফাঁকগুলি কিন্তু ব্রাশের মতো পরিষ্কার করা যাবে না।

এ ছাড়া আর একটি অভ্যাস বিশেষ প্রয়োজনীয়। যতবার কিছু খাওয়া যাবে, ততবার ভাল করে কুলকুচো করতে হবে, বিশেষ করে রাত্রের আহারের পর। শিশু কিশোররা লজেন্স, চকোলেট খাবার পরও এটা প্রযোজ্য। দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা থেকে গেলেই অথবা লজেন্সের আঠালভাব লেগে থাকলে, দাঁতের ক্ষত এবং মাড়ির স্বাস্থ্য খারাপ হবার সম্ভাবনা।

25A, নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-6

তড়িৎ-লেপনের সহজ কথা

স্নিগ্ধ মজুমদার

ধরা যাক, তুমি কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছ। সারাদিন হইচই করে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকে তোমার প্রিয় খাবারের অর্ডার দিলে। খাবার সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল, কিন্তু সঙ্গে একটা নোংরা, চটাওঠা চামচ। স্বভাবতই তোমার, খাবারটা সেই চামচে দিয়ে মুখে পুরতে একটু দ্বিধা হবে, একটু অস্বস্তি হবে। কিন্তু তোমায় যদি সেই একই খাবার একটা ঝক-ঝকে চামচে দিয়ে খেতে দেওয়া হয়, তুমি খেতে দ্বিধা করবে না, সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে নেবে। তোমার মনের এই যে দ্বিধা, এর জন্যে কিন্তু খাবারের কোন দোষ নেই। তোমারই ওই নোংরা চটা-ওঠা চামচটা দেখে খেতে ইচ্ছা করছে না। ওই একই চামচে যদি ঝকঝকে চকচকে হয়ে তোমার কাছে আসে, তবে তুমি সানন্দে তা গ্রহণ করবে, তা দিয়ে নির্ভয়ে খাবার খাবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কিভাবে চামচটাকে রঙ করে সোনার মতো ঝক্-ঝকে করে তোলা যায়? তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সাধারণভাবে রঙ করলে হবে না। কারণ চামচ, কাঁটা, ছুরি ইত্যাদি দিনরাত্রি ধোওয়া মোছা হয়। সাধারণভাবে রঙ করলে কিছুদিনের মধ্যেই তার সাধারণ ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায় এবং রঙ উঠে যাবে। প্রত্যেক সপ্তাহে তো আর নতুন চামচ কেনা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই ভৌতবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, চামচে, ছুরিকাটা ইত্যাদি হলো অতি দরকারী জিনিস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন লাখে লাখো চামচ, ছুরি, কাঁটা, উৎপন্ন করতে হয়। স্বভাবতই সাশ্রয়ের জন্যে নিকৃষ্ট ধাতু দিয়ে এগুলি তৈরী করতে হয়। বাংলায় একটা প্রবাদই আছে—'সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মানো।' এর মানে হলো অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মানো। বুঝতেই পারছ তা হলে সোনার চামচ একটা অতি দামী বস্তু। কিন্তু বিজ্ঞানের অবদানের ফলে আমরা যে চামচ বাড়িতে ব্যবহার করি তা স্বর্ণনির্মিত নয়, কিন্তু সোনার মতোই ঝকঝকে। তা বারবার ধুলেও রঙ ওঠে না এবং তা দিয়ে খেয়েও তৃপ্তি।

এর মূলে আছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং তাঁদের অক্লান্ত সাধনা। বিজ্ঞানী আরহেনিয়স ছিলেন এমনি একজন বিজ্ঞানী। 1887 খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর তড়িৎ-বিয়োজনবাদ প্রবর্তন করেন। এই তড়িৎ-বিয়োজনবাদ আজও সু-প্রতিষ্ঠিত।

তড়িৎবিশ্লেষণ কি, তা নিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই সহজ। নিশ্চয়ই জানো, বজ্রপাতের সময় কাছাকাছি লোহার তারকে স্পর্শ করে থাকলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এর কারণ হলো লোহা, তামা অ্যালু-মিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ অনায়াসে চলাচল করতে পারে। এদের বলা হয় তড়িৎপরিবাহী। এদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে। কোন কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচলের ফলে তাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। যেমন তামা, লোহা ইত্যাদি।

আবার কিছু পরিবাহী পদার্থ, যেমন নানান অ্যাসিডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এই পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

সংক্ষেপে একেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলা হয়। যাই হোক যা বলছিলাম, চামচ, কাঁটা ছুরি ইত্যাদি তো তৈরী হয় নিকৃষ্ট ধাতু যথা লোহা, তামা ইত্যাদি দিয়ে। তারপর এর উপর সোনা রূপা নিকেল ইত্যাদি উৎকৃষ্ট– ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকেই তড়িৎলেপন বলে। এর ফলে জিনিসগুলি সুদৃশ্য হয় এবং জলবায়ুর প্রকোপ থেকে রেহাই পায়। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ ব্যাপারটা হচ্ছে কিভাবে।

তার আগে তোমাদের জানতে হবে, তড়িৎ-কোষ, পজেটিভ ও নেগেটিভ মেরু এবং অ্যানোড ও ক্যাথোড কি।

রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয় যে পাত্রের মধ্যে তাকে বলে তড়িৎ-কোষ।

পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারকে যথাক্রমে বলা হয় অ্যানোড ও ক্যাথোড।

পজিটিভ ও নেগেটিভ মেরু হলো বিদ্যুৎসংলগ্ন দুই প্রান্ত।

ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তুতে প্রলেপ দিতে হবে, এদের কস্টিক সোডা ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসি-ডের দ্রবণে প্রথমে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর সেগুলো একটি দণ্ড থেকে একটি পত্রের ভিতর ডোবানো হয়। পাত্রটিকে তড়িৎ-পাত্র বলে। দণ্ডটির সঙ্গে তড়িৎ-কোষের নেগেটিভ

মেরু যোগ করা হয়। অপর একটি দণ্ড থেকে যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে (যথা সোনা, রূপা) তার কয়েকটি বিশুদ্ধ পাত লাগানো থাকে। তড়িৎকোষের পজিটিভ মেরু এই দণ্ডটার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যখন রূপার প্রলেপ দেওয়া হয় তখন পাত্রে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ থাকে এবং রূপার পাত অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোষ থেকে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্যে রূপার পাত থেকে রূপার অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং ঝুলন্ত বস্তুগুলির উপর জমা হয়ে বস্তুগুলির চারধারে রূপার আবরণ সৃষ্টি করে। কিছুক্ষণ এইভাবে চললে বস্তুগুলির উপর রূপার প্রলেপ পড়ে। লোহার উপর নিকেলের প্রলেপ দিতে হলে নিকেলের পাত ও নিকেল সালফেটের দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

পেতলের উপর এইভাবে সোনার আবরণ দেওয়াকে 'গিল্টি' করা বলে। এক্ষেত্রে পটাশিয়াম সায়ানাইডের সঙ্গে গোল্ড সায়ানাইড মিশিয়ে তড়িদ্-বিশ্লেষ্য তৈরি করা হয়।

এই পদ্ধতিতে অন্যান্য নানা ব্যবহার্য জিনিসপত্রতে ঔজ্জ্বল্য আনা হয়।

আজকাল যে ইমিটেশান গয়নার এত চল, তাও ওই তড়িৎ-লেপনেরই কৃপায়। পিতল বা অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুর গয়নার উপরে এই পদ্ধতিতে সোনার গিল্টি করা হয়।

70 বালীগঞ্জ গার্ডেনস, কলি—29

প্লাস্টিকের অবদান

দিলীপকুমার সরকার

প্রকৃতির সম্পদ যেমন অফুরন্ত, মানুষের চাহিদাও তেমনি আকাশছোঁওয়া। প্রকৃতিকে ছেঁকে, ছেনে, বদল ঘটিয়ে মানুষের কাজে লাগানোর যে বিভিন্ন পর্যায়, সভ্যতার ইতিহাসে তারাই এক একটা 'মাইলস্টোন'। এর আদি যুগ যেমন 'প্রস্তর যুগ, তেমনি পর্যায়ক্রমে এসেছে 'লৌহ যুগ', 'ব্রোঞ্জ যুগ' ইত্যাদি। এখন আমরা যে যুগে বাস করছি ব্যবহারিক দিক দিয়ে তাকে এক কথায় বলতে পারি 'প্লাস্টিক যুগ'। কেন একথা বললাম তা একটু তলিয়ে দেখা যাক্।

প্লাস্টিকের আবিষ্কার গত শতকের শেষের দিকে। সেই সময়ে গল্‌ফ খেলার বল হিসেবে হাতির দাঁতের বল ব্যবহার করা হত। আফ্রিকার বনে শিকারিদের হাতে হাতি ক্রমশঃ মারা পড়তে থাকায় হাতির দাঁত পাওয়া নিয়ে মহা সমস্যা দেখা দিল। বাধ্য হয়ে গল্‌ফ্ খেলার পরিচালকরা নকল হাতির দাঁত আবিষ্কার করার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তখনই আবির্ভাব হ'লো সেলুলয়েডের। দেখা গেল নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে একটু কর্পূর মিশিয়ে দিলেই যেটা পাওয়া যায় তা দিয়ে সহজেই গল্‌ফ্-এর বল বানানো যায়। সেলুলয়েডই হচ্ছে প্রথম প্লাস্টিক। তাই একে বলা হয় 'সব প্লাস্টিকের ঠাকুরদা'।

রবার, সুতো, রজন এরা সবাই হচ্ছে প্লাস্টিকের জাত ভাই। এদের মধ্যে তফাৎ খুবই কম এবং সকলেই 'হাই পালিমার' গোষ্ঠিভুক্ত! এরা সকলেই হচ্ছে অতিকায় অণু। এ যুগটাই হচ্ছে 'অণোরণিয়ান মহতো মহীয়ান' অর্থাৎ খুব বড়ো আর খুব ছোটোর যুগ। হালফিল যতজনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁদের অনেকেই অতিকায় অণুর গবেষক। এঁদের মধ্যে আছেন প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞান অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানা।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে বেকেল্যাণ্ড নামে এক বেলজিয়ান রসায়নবিদ প্রথম বেকেলাইট আবিষ্কার করেন। অবশ্য তাঁর আগে বহু জৈব-রসায়নবিদ গবেষণাগারে রাসায়নিক সংশ্লেষের সময় রজনের মতো এক ধরনের বস্তু পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না ভেবে তা ফেলে দিয়েছিলেন। বেকেল্যাণ্ডই প্রথম এধরনের জিনিষের সঙ্গে কাঠের পুঁড়ো মিশিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী বেকেলাইট তৈরী করলেন। এ দিয়ে আমরা এখন ইলেকট্রিক সুইচ ইত্যাদি তৈরী করে থাকি। এই বেকেলাইট হচ্ছে প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক।

বেকেলাইটের একটা অসুবিধে হলো এই যে, এটা অস্বচ্ছ এবং কালচে—যা অনেকেরই পচ্ছন্দসই নয়। তাই দরকার হ'লো রঙিন প্লাস্টিকের। ফলে আবিষ্কার হলো

ইউরিয়া ফরম্যালেডিহাইড, মেলামিন ফরম্যালডিহাইড ইত্যাদি। এসব দিয়ে তৈরী হলো থালা, বাসন, খাবার টেবিলের উপরিভাগ, আরো কত কি।

এই শতকের প্রথমার্ধে অনেক নতুন প্লাস্টিকের আবির্ভাব হলো। যেমন, পলিষ্টাইরিন, পলিমিথাইল মেথাক্রাইলেট যা পারসপেক্স গোষ্ঠিভুক্ত, পলিইথিলিন, পি. ভি. সি, টেভলন ইত্যাদি। এদের মধ্যে পি. ভি সি আর পলিথিথিলিনের চলন সবচেয়ে বেশি।

এই শতকের সবচেয়ে বড়ো দুটো আবিষ্কারের মধ্যে একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স, আর একঠা প্লাষ্টিক বা হাই-পলিমার। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক্সের দৌলতে পাই রেডিও, ট্রানজিস্টার, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে দামী। কাজেই এগুলো রয়েছে অর্থবান লোকদের নাগালের মধ্যে। কিন্তু পলিষ্টাইরিনের প্যাকিং ও পি. ভি. সি, র জুতো তো সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও নিম্নবিত্তের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই বলা যায় প্লাষ্টিক হচ্ছে এমনই এক জিনিস যা গরীর বড়লোকের মধ্যে সাম্য এনে দিয়েছে। এখন ট্রেনপথে টাকায় তিনটে চিরুনী পাওয়া যায়। পলিষ্টাইরিন নামে প্লাষ্টিকটা না থাকলে কে তোমাদের এত কম দামে চিরুনী দি'ত? দোকানে যে অসংখ্য খেলনা দেখতে পাও তার বেশির ভাগই তো পলিষ্টাইরিনের। মেয়েদের হাতব্যাগ, হাত-ঘড়ির ট্রাপ —এ সবই তো পি. ভি. সি. র দৌলতে। মাত্র আশি টাকায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে যে কনটাক্ট লেন্স পাওয়া যায় তা তো পলিমিথাইল মেথাক্রাইলেটের দৌলতে।

এতদিন যে সব প্লাষ্টিক কাজে লাগানো হচ্ছিল তাদের অণুগুলো ছিল বেয়াড়া বেখাপ্পাভাবে সাজানো। ফলে অণুগুলো স্ফটিকাকার ছিল না। 1950 সালের পর প্লাষ্টিক-জগতে ঘটলো এক বিরাট আবিষ্কার। সেটা হচ্ছে স্ফটিকাকার প্লাষ্টিক। এই ধরনের প্লাষ্টিকের বিশেষ গুণ হ'লো এই যে, এগুলি শক্ত, ঘাতসহ ও দৃঢ়।

এই আবিষ্কারের ফলে প্লাষ্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উদ্ভব হলো। প্লাষ্টিক খেলনা বা ঠুনকো জিনিসের গণ্ডী ছাড়িয়ে শিল্পে ব্যবহৃত হতে লাগলো। উন্নত দেশে কাচের বোতল প্রায় উঠে যাওয়ার মত হলো। রঙিন প্লাষ্টিকের ফার্নিচারের ঢেউ সব বাড়িতেই লাগলো। একে আরও শক্ত করার চেষ্টা চললো। ফলে পাওয়া গেল 'রিইন-ফোরসড্ প্লাষ্টিক'। এতদিন ঘর সাজানোর ব্যাপারে প্লাষ্টিক কাজে লাগছিল, এবার থেকে গৃহনির্মাণ শিল্পে পিলার বা কড়ি-বরগা হিসাবেও তার ব্যবহার শুরু হলো। এদিয়ে এমন কি বাড়ি-ঘরও বানানো গেল। খনি থেকে পেট্রোলিয়াম তোলার সময় ড্রিলিং টিউবের মুখে হীরের বদলে 'ইপক্সি কোর' ড্রিল ব্যবহার করা গেল। 'ইপক্সি বোরনের করাত দিয়ে ইস্পাতও কাটা সম্ভব হলো। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক বিশেষ ধরনের প্লাষ্টিক-ব্লেড আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যা দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের সারাজীবন দাড়ি কাটা সম্ভব হবে।

দেহযন্ত্রের পরিচর্যাতেও প্লাষ্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। দাঁত পড়ে গেলে আগে হাড়ের দাঁত ব্যবহার করা হত। এগুলো ভারী। তা ছাড়া অন্যান্য অস্বস্তিও ছিল। এখন প্লাষ্টিকের দাঁতের চলন হয়েছে। এগুলো অনেক হালকা, আরাম বেশি, দামেও কম। প্লাষ্টিকের দৌলতে আমরা কঠিন, মাঝামাঝি নরম এবং নরম কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে পারছি। কাপড় ময়লা হলে যেমন ধোপাবাড়িতে দেওয়া হয়, তেমনি যাদের কিডনি খারাপ হ'য়ে গেছে তাদের মাঝে মাঝে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে তাদের অবিশুদ্ধ রক্তকে এক অতি পাতলা প্লাষ্টিকের টিউবের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় এবং ঐ টিউবের চারপাশে বিশুদ্ধ জল রাখা হয়। তাতেই তাদের রক্তের ময়লা দূর হয়। হৃদযন্ত্রের ভালভ খারাপ হয়ে গেলে তার বদলে প্লাস্টিকের ভালভ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ট্যাবলেট খাওয়ার অনেক পরে ক্রিয়া হওয়া দরকার, আজকাল প্রায়ই সেগুলো প্লাষ্টিকের কোটিং দেওয়া ক্যাপসুল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্লাষ্টিক, যা গল্‌ফ্ খেলার বলের বিকল্প হিসেবে প্রথম বানানো হয়েছিল, সময় ও প্রয়োজনের তাগিদে তা জীবনের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কি দেহযন্ত্রে, কি যন্ত্রাংশ, কি কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের জীবন সবদিকেই এর স্বচ্ছন্দ প্রসার। এমন কি মহাকাশযাত্রায় মহাকাশযানেও বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে।

দ্রিপর্ণ, কলিকাতা-27

বেশ তো! আমাদের ১১,০০০ ইঞ্জিনের মধ্যে বেছে নাও কোনটি তোমার পছন্দ; —এদের মধ্যে ৮,০০০ টিরও বেশি হল স্টীম ইঞ্জিন, ২,০০০-এর কিছু বেশি ডিজেল আর প্রায় ১,০০০ হল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। এছাড়াও রয়েছে কয়েকশ 'এমু' কোচ। এখন সারা দেশ জুড়ে ৭৫,০০০ কিমি রেলপথে ৭,০০০-এরও বেশি স্টেশন আছে। তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে স্টেশনের সংখ্যা আরও কত বেড়ে গেছে; বেড়ে গেছে রেলপথের দৈর্ঘ্য। তাছাড়া, তখন আরও দ্রুতগামী ডিজেল আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। জানো কি এইসব ইঞ্জিন এখন এ দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং কিছু কিছু রপ্তানীও করছি আমরা।

কিন্তু শুধু রেলগাড়ী চালাবে কেন, সারা রেলওয়েকে চালানোর দায়িত্বও একদিন তোমাদের হাতে এসে পড়বে। দেশকে আরো দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ তো তোমাদেরই কাজ। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ—দেখবে কত মজার কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক 'J'

বিবেক রায়

ভৌত বিজ্ঞানের 'তাপ' অধ্যায়ের পাতাগুলি ওল্টালেই নজরে পড়ে যাবে J অক্ষরটি। বিশিষ্ট ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী জেমস প্রেসকট জুল (1818 – 1889)-এর নামের পদবীর আদ্যক্ষর 'J'। তাই 'J' বলতে আমরা বুঝি জুলের ধ্রুবক বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক।

বিজ্ঞান বই পড়ে আমরা এখন জেনেছি যে, শক্তি হলো অবিনশ্বর অর্থাৎ এর বিনাশ নেই। তবে শক্তির রূপান্তর সম্ভব। তাপ একপ্রকার শক্তি। যান্ত্রিক, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ইত্যাদি নানারকম শক্তি থেকে তাপ শক্তি পাওয়া যায়। তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরের চাবিকাঠি ঐ একটিই, নাম যার 'J' বা জুলের ধ্রুবক।

কিভাবে এই জুলের ধ্রুবক বা 'J'-এর আবির্ভাব ঘটলো তা জানবার আগে তাপের স্বরূপ জানবার ইতিহাসটা জেনে নেওয়া যাক্। ঘর্ষণের ফলে যে তাপের উদ্ভব ঘটে, তা প্রস্তর যুগের মানুষেরাও জানত। পাথরে পাথর ঠুকে তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং সেই সঙ্গে তাপ শক্তি সৃষ্টি করতে পারত। প্রস্তর যুগের সেই সব মানুষ তাপ সৃষ্টি করতে পারলেও তাপের আসল প্রকৃতি কেমন তা কিন্তু জানত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা তাপকে মনে করতেন, একরকম ওজনহীন স্থিতিস্থাপক পদার্থ। সেই কাল্পনিক পদার্থের একটা নামও তাঁরা দিয়েছিলেন। নামটি হলো 'ক্যালোরিক।' তাঁরা মনে করতেন যে, কোনও বস্তুর অণুগুলির মধ্যেকার ফাঁকটুকু ভরা থাকে ঐ কাল্পনিক পদার্থ 'ক্যালোরিক' দিয়ে। তাঁরা ভাবতেন যে, কোনও এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ক্যালোরিক পদার্থের প্রবাহই হলো তাপের প্রবাহ। কোনও বস্তুতে ক্যালোরিক পদার্থ প্রবেশ করিলে সেই বস্তুটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার বিপরীত ক্রমে, কোনও বস্তু থেকে ক্যালোরিক পদার্থ বেরিয়ে গেলে বস্তুটি শীতল হয়। তাপের এই আদান-প্রদানের ফলে বস্তুর ওজনের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেটা লক্ষ্য করেই সেকালের বিজ্ঞানীরা ক্যালোরিক পদার্থকে ওজনশূন্য বলে মনে করতেন। আবার তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, ঘর্ষণের ফলে তাপের উৎপত্তি হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য ছিল, এইরকম ঘর্ষণের ফলে ক্যালোরিক পদার্থ ঘর্ষণকারী বস্তু থেকে বেরিয়ে যায়, তাই তাপের উৎপত্তি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাপের এই ক্যালোরিক মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে লাগলো। এই মতবাদের উপর প্রথম আঘাত হানলেন বেঞ্জামিন টমসন ওরফে কাউণ্ট রামফোর্ড 1798 সালে। মিউনিখের এক অস্ত্রাগারে কামানের নলে ছিদ্র করতে গিয়ে কাউণ্ট রামফোর্ড লক্ষ্য করলেন যে, ছিদ্র-করা নল এবং ছিদ্র করবার যন্ত্র 'তুরপুন' দুটোই গরম হচ্ছে। রামফোর্ড ভাবলেন, ক্যালোরিক মতবাদ অনুসারে আশেপাশের বায়ুমণ্ডল থেকে ক্যালোরিক পদার্থ বর্জন করার ফলে বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়েছে।

রামফোর্ড বায়ুমণ্ডলের প্রভাব এড়াবার জন্যে অন্য কথা চিন্তা করলেন। ধাতুখণ্ডকে জলে ডুবিয়ে ছিদ্র করলে ক্যালোরিক মতবাদ অনুযায়ী ধাতুখণ্ডকে গরম হতে হলে জলকে হতে হবে ঠাণ্ডা। রামফোর্ড সেই ভাবনার বশবর্তী হয়ে জলের মধ্যে ধাতুখণ্ডকে ডুবিয়ে রেখে পরীক্ষা করে কিন্তু অন্য ফল পেলেন। জল সেক্ষেত্রে ঠাণ্ডা না হয়ে দারুন গরম হয়ে উঠলো। রামফোর্ডের এই পরীক্ষায় ক্যালোরিক মতবাদ এই প্রথম বড়রকমের একটা ধাক্কা খেলো। রামফোর্ড বললেন, তাপ ক্যালোরিকের মতো কোন পদার্থই নয়। তাপ গতিশক্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রামফোর্ডের এই পরীক্ষার ঠিক এক বছর বাদেই লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিস্ট্যুটের স্যার হামফ্রি ডেভি পরীক্ষা করে দেখালেন যে, দু'টুকরো বরফ ঘষলে জল উৎপন্ন হয়। তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, বরফের মধ্যেকার ক্যালোরিক পদার্থের চেয়ে জলের মধ্যে ক্যালোরিক পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে। আবার তাপ না পেলে বরফ গলতে পারে না, এও সত্যি। তবে বরফ গলা জলে বেশি পরিমাণে তাপ কোথা থেকে এলো? ক্যালোরিক মতবাদ দিয়ে এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে ক্যালোরিক মতবাদ পরিত্যক্ত হলো। তার জায়গায় স্বীকৃতি লাভ করলো এক নতুন তত্ত্ব। রামফোর্ড ও ডেভির পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে,

পদার্থের অণুগুলিতে গতিশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হলো তাপশক্তি। একটি বস্তুকে অপর এক বস্তু দিয়ে যত বেশি গতিতে ঘষা হবে, বস্তুটি তত বেশি উত্তপ্ত হবে। সাইকেলে পাম্প করার সময় দেখা যায় যে, পাম্প যন্ত্রটি ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু কেন? পাম্পের প্রিস্টনের ধাক্কায় বায়ুর অণুগুলির গতি বেড়ে যায়। আর অণুগুলির গতি বেড়ে যাওয়ার দরুনই পাম্প যন্ত্রটি গরম হয়।

চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো যায়। ড্রিল মেশিন চালিয়ে গর্ত করবার সময় প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়। উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাওয়ার সময় বায়ুকণার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে অত্যন্ত উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি বা কার্য রূপান্তরিত হয় তাপে।

আবার স্টীম ইঞ্জিনে কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার দ্বারা ইঞ্জিন চলে। মোটরগাড়িতে পেট্রোল পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায়, তা মোটরগাড়িকে চালাতে সাহায্য করে। এসব ক্ষেত্রে তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি বা কার্য পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাপ থেকে কার্য এবং কার্য থেকে তাপ পাওয়া সম্ভব।

এতদিনে বোঝা গেল যে, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটি ম্যানচেস্টারের বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস প্রেসকট জুল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করলেন। 1840 সালে একটি পরীক্ষা দ্বারা তিনি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি প্রমাণ করলেন। প্রমাণ করলেন যে, কার্য যখন তাপে কিংবা তাপ যখন কার্যে রূপান্তরিত হয়, তখন একটি অন্যটির সমতুল্য হয়। তার মানে, যদি W পরিমাণ কার্য করে H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তবে $W \propto H$ অর্থাৎ কার্য, উৎপন্ন তাপের সমানুপাতী হয়। $W \propto H$ হলে $W = JH$ হবে এবং সেক্ষেত্রে J হবে একটি ধ্রুবক। ঐ ধ্রুবকটিই হলো জুলের ধ্রুবক বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক। একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কার্যের প্রয়োজন হয়, তাকেই তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলে।

এরপর অনেক বিজ্ঞানী অনেক পরীক্ষা চালিয়ে J-এর মান নির্ধারণ করলেন। এখন সি, জি, এস, বা মেট্রিক পদ্ধতিতে J-এর মান হচ্ছে $4{\cdot}18 \times 80^7$ আর্গ প্রতি ক্যালোরি। আর এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে J-এর মান হচ্ছে 778 ফুট পাউণ্ড প্রতি বৃটিশ থার্মাল একক।

J-এর মান তো জানা গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কি কাজে লাগবে J? এক কথায় উত্তর দিতে দিতে গেলে বলতে হবে যে, শুধু যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে নয়, তড়িৎশক্তিকেও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে এই ধ্রুবকটির প্রয়োজন হয়।

মনে কর, নির্দিষ্ট ভরের কোনও একটি উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার ফলে উল্কাটির গতিবেগ কমে গেল। উল্কার গতিবেগের পরিবর্তনের ফলে কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হলো?

এ প্রশ্নের সমাধান যদি করতে চাও, তা হলে উল্কার গতিশক্তির পরিবর্তনের মানকে J-এর মান দিয়ে ভাগ কর। তা হলেই পেয়ে যাবে উৎপন্ন তাপের মাত্রা।

J-এর সাহায্যে আমরা তাপগতিবিদ্যার এমনি অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারি। তাই J-কে তাপ-গতিবিদ্যার 'জনক ধ্রুবক' বলা হয়।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (1956)-8 ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হলো।

1. প্রকাশস্থান ঃ 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073
2. প্রকাশকাল ঃ মাসিক
3. প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073
4. সম্পাদক ঃ রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073
5. যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ারগ্রহীতা, তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ

(ক) মালিক ঃ রবীন বল, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার ঃ রবীন বল, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073

আমি রবীন বল এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) রবীন বল

1 মার্চ 1983 প্রকাশক

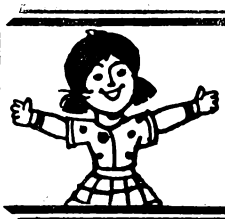

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা ফেব্রুয়ারী 83 সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, বুলু চ্যাটার্জি, পন্না চ্যাটার্জী, শুভাশিষ আতর্থী, ইন্দ্রনীল ঘোষ, মিতা মণ্ডল, রুমা মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, তন্দ্রা দাশ, শৌভিক নন্দী, কৌশিক নন্দী, মণীন্দ্র নাথ পাত্র, আশিসকুমার সাহা, সাধনা ব্যানার্জী, সান্ত্বনা ব্যানার্জী, স্বরূপ ব্যানার্জী, সাগরময় সেনশর্মা, স্বপন দত্ত, অতনু নাগ, ভানু অধিকারী, কানাইলাল বসাক, ভোলানাথ দলুই, মিলনকুমার দাস, প্রবীর ভট্টাচার্য, দুর্গা মাথুর, মিঠু মুখার্জী, ভাগীরথী সেন, পি কে ব্যানার্জী, রিংকু পোদ্দার, কৈলাশ নায়েক দিব্যেন্দু পানিগ্রাহী।

24 পরগনা ঃ গৌতম শাসমল, সুমিত মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র মজুমদার, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, দীপক চক্রবর্তী, সোমনাথ ঘোষ, তাপস সিংহ, অলোক দাস, আশিস রায়, তমাল ঘটক, কিংশুক প্রামাণিক, কৌশিক প্রামাণিক, মিতালি সরকার, প্রদীপ সরকার, উৎপল বিশ্বাস, স্মৃতিকণা কর, সন্দীপ কর, সৌমেন কর।

হাওড়া ঃ সুভাষ রায়চৌধুরী, গৌতমকুমার পাণ্ডা, পাপিয়া মজুমদার, দেবাশিস ঘোষ, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, অনুপ ভৌমিক, বিনিময় চাকমা, পল্লব চট্টোপাধ্যায়, সোমা চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, পার্থ দাস।

হুগলী ঃ আশিস দে, অনিল দে, দেবাশিস সাহা, দীপঙ্কর সাহা, সর্বেন্দু সিংহরায়, নীলমণি দাস, অমলকুমার জানা, সৌরভ সরকার, অপর্ণা ভট্টাচার্য, শ্রাবণী মালাকার, সব্যসাচী চক্রবর্তী, তাপস দে, মাণিক সরকার, অভিজিৎ কুণ্ডু, সন্দীপ কুণ্ডু, তাপস কুণ্ডু, মানস কুণ্ডু, চঞ্চল কুণ্ডু, অনামিকা সাহা, প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, শান্তনু মিত্র, পলাশ মুখার্জী, মানব সাহা, তন্ময় ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, অংশুমান পাল, সুপ্তিশ্রী মণ্ডল, বনশ্রী মণ্ডল, পুষ্পেন্দু মণ্ডল, সন্দীপ নাগ, অভিজিৎ রায়, সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখার্জী, অম্বরজিৎ রায়, সঞ্জয় দাস, অসীমকুমার পাল, নেপালচন্দ্র মাল, বনমালী প্রামাণিক, প্রত্যুষ চ্যাটার্জী, প্রেমানন্দ চক্রবর্তী।

বর্ধমান ঃ কৃষ্ণগোপাল সেন, দিলীপ গোস্বামী, সঞ্জয় মুখার্জী, মৌলীকিশোর মণ্ডল, বিশ্বরূপ সরকার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার কুণ্ডু, গঙ্গাধর খাণ্ডেলওয়াল, দীপা খাণ্ডেলওয়াল, সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য, মোহিতকুমার নন্দী।

মেদিনীপুর ঃ স্বপনকুমার মাহাতো, মলয়কুমার মাহাতো, স্বদেশকুমার মাহাতো, শক্তি ত্রিপাঠী, স্মৃতিকণা ত্রিপাঠী, প্রদীপ ত্রিপাঠী, প্রশান্ত ত্রিপাঠী, সুশান্ত ত্রিপাঠী. সোমনাথ দ্বিবেদী, রঞ্জনকুমার সান্যাল, রঞ্জনকুমার পানি, কঙ্কনকুমার পানি, চন্দনকুমার পানি, শ্যামলেন্দু ভৌমিক, দীপককুমার ষড়ঙ্গী, সর্বাণী ষড়ঙ্গী, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, অনন্ত ব্যানার্জী, লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, দেবাশিষ মণ্ডল, প্রসিতকুমার সরকার, নীতা বিষ্ণু, মলয়কান্তি শতপথি, অরুণাভ সোম, সংঘমিত্রা সোম, সুদীপ ঘোষ, সুজিত পাত্র, সুমিত ঘোষ, অমিতাভ সোম, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অমিয়কান্তি বিশ্বাস, অনুপকুমার দাস, তুষারকান্তি পাল, বিকাশ বিশ্বাস, শত্রুঘ্ন বেরা।

নদীয়া ঃ মানস কুণ্ডু, শ্যামল পোদ্দার, অতীন্দ্রনাথ মৈত্র, দাঁতালচন্দ্র বিশ্বাস, স্বপনকুমার মল্লিক, সুব্রতকুমার দাস, সুশান্তকুমার রায়, রমেশচন্দ্র পাল, সুশান্তকুমার দাস, দীপককুমার রায়, সুনীলকুমার কবিরাজ, অনিলকুমার কবিরাজ, নিখিলকুমার কবিরাজ, সুশীলকুমার কবিরাজ, সুশান্তকুমার কবিরাজ, প্রশান্তকুমার কবিরাজ, আশিস বিশ্বাস, দেবজ্যোতি ঘোষ, দেবু মণ্ডল, আরতি ঘোষ,

বীরভুম ঃ শম্পা সিংহ, চন্দন সিনহা, জীবনকুমার নাগ, দীপনারায়ণ দত্ত, সুমিতা দত্ত।

বাঁকুড়া ঃ উমা চ্যাটর্জী, স্বপ্না চ্যাটার্জী, তপতী চ্যাটার্জী, শ্যামল মিশ্র, অজয় মিশ্র, ফাল্গুনী মিশ্র।

মুর্শিদাবাদ ঃ সঞ্জীব সরকার, পার্থ সান্যাল, পলাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, বশীরউদ্দীন, হাসিনা মাহাবুব, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ, দিব্যেন্দু রায়, কাজি জানে আলম, পারভেজ জামান, শামসাদ নার্জানন, ইয়াসমিন নেগার, দেবাশিস সাহা, সৌমাভ দে, মহাব্রত দাস, বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল, অভিজিৎ চ্যাটার্জী, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, কৌস্তভ সান্যাল।

পঃ দিনাজপুর ঃ শুভময় কমল গুহ, অমর্ত্য রায়।

মালদহ ঃ কল্লোল নন্দী, অনিমেষ মিশ্র, সৌমেন্দু মিশ্র।

বিহার, কাটিহার ঃ রাম চক্রবর্তী, হরি চক্রবর্তী, গণেশ চক্রবর্তী।

ধানবাদ ঃ জয়দেব ঘোষ।

প্রশ্নোত্তর

1 প্রশ্ন ঃ—সুস্থ মানুষ শীতের প্রকোপে প্রাণ হারায় কেন ?

প্রভাতকুসুম রায়, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

উঃ—মানুষ শীতে মারা যায়, এরকম সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই সুস্থ ছিলেন এটা অনুমান করা ঠিক নয়। সুস্থ মানুষ সুস্থ পরিবেশে মারা যাবার সম্ভাবনা নেই। যারা মারা যায় তারা বেশির ভাগই আশ্রয়হীন উন্মুক্ত পরিবেশে থাকে এবং তাদের আর্থিক সঙ্গতি কম থাকায় তারা অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সেজন্যে তাদের সহ্যশক্তি কম থাকে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় শারীরিক বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়। সেজন্যে তারা শীতের প্রকোপে মারা যায়।

2 প্রশ্ন ঃ—মাংস খেলে আমরা হজম করতে পারি। কিন্তু আমাদের পেটের মধ্যে যে মাংস আছে, সেই মাংস আমাদের হজম হয় না কেন ?

সজল দত্ত,রানাঘাট, নদীয়া

উঃ—আমরা মাংস খেলে পাকস্থলীতে গিয়ে সেগুলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, পেপসিন এবং কয়েকটি অনুঘটকের সংস্পর্শে এসে গলে যায় ও হজম হয়। পেটের মধ্যে যে মাংস আছে (খাদ্যনালীর মাংসপেশী দ্বারাই গঠিত) তা সম্পূর্ণভাবে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। সেজন্যে মাংসপেশীগুলি উপরিউক্ত পাচকরসের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

3 প্রঃ—আমি একটা রুবিক কিউব কিনিয়া পথ হারায়াছি। পরের কোন সংখ্যায় এর সমাধান দেওয়া হবে কি ? সোমা দাস, ইচ্ছাপুর।

উঃ—বিভিন্নভাবে পথ হারানোর জন্যে ফিরে আসার পথও বিভিন্ন। সুতরাং তুমি Don Taylor-এর Rubik Cube বইটি কোন দোকান থেকে কিনে ফেলতে পারো। তা হলে ফিরে আসার আর কোন অসুবিধে হবে না।

4 প্রঃ দোলের সময় যে 'ভ্যানিসিং কালার' ব্যবহার করা হয়, সেটা কিভাবে তৈরী করা যায় এবং রঙটা উবে যায় কেন ?

অভিজিত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-14

ফেনোলপথালীন ও তরল অ্যামোনিয়া দুটি রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে 'ভ্যানিসিং কালার' তৈরী করা হয়। অ্যামোনিয়া ক্ষার ধর্মীয় বলে ফেনোলপথালীন লাল রঙ হয়ে যায়। অ্যামোনিয়া উদ্বায়ী হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সেটা উবে যায় এবং রঙটা আর থাকে না।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

1. 'ফটো সেল' কি জিনিস ?
2. গো-শালা, মূত্রাগার প্রভৃতি স্থানে যে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়, তা কোন্ গ্যাসের ?
3. স্টীমের লীন তাপ কত ?
4. কোন্ ভিটামিন ক্ষতনিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে ?
5. কোন্ তড়িৎকোষে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয় ?
6. লেড সালফাইড যৌগটির রঙ কেমন ?
7. ব্যারোমিটারের পাঠ হঠাৎ নেমে গেলে কি বুঝতে হবে ?
8. কোন্ পদার্থ দিয়ে তড়িৎচুম্বক তৈরি করা হয় ?
9. আলোর আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যে কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় ?
10. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের মানকে কি বলা হয় ?
11. ডিমে কোন্ ভিটামিন থাকে না ?
12. একটি বুদবুদের স্থিতিশক্তি বেশি কোথায় ? জলের তলায়, না জলের উপরিভাগে ?
13. অভিকর্ষ শক্তিকে কি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় ?
14. থার্মোমিটারের কোন্ স্কেলের বাস্তব অস্তিত্ব নেই ?
15. কাঁচির হাতল লম্বা হলে সুবিধা না অসুবিধা হবে ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

ফেব্রুয়ারী 1983 সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর

1. কাণ তিন ভাগে বিভক্ত। বহিঃ কর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃ কর্ণ। 2. মধ্যকর্ণ মূলতঃ তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা গঠিত। সেই ক্ষুদ্রাস্থিগুলির নাম হলো ইনকাস, সেটপিস ও ম্যালিয়াস। 3. কোকলিয়া (Cochlea)। 4. National Academy of Science। 5. 20 আয়তন। 6. ওজোনের সংস্পর্শে নীল বর্ণহীন হয়ে যায়। 7. ময়সা (Moissan)। 8 অধিশোষণ বা বহিঃধৃতি (Adserption)। 9. বস্তুর তাপগ্রাহিতা (Thermal Capacity) বলে। 10. ইউটেকটিক পয়েন্ট বলে। 11. এক পাউণ্ড তুলা। 12. একবার (Bar) চাপ বলা হয়। 13. 5 gm/cc. 14. গোলকের জ্যামিতিক কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে। 15. ফরাসী গণিতবিদ পি, ভানিয়ার আবিষ্কার করেন। 16. প্রায় 24,5°।

জানার কথা

সুধীরকুমার দাস

মৎস্যবিহীন নদী

নদীতে কোনও মাছ নেই—কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীতে এমন একটি নদী আছে যে নদীতে কোনও মাছ নেই। নদীটি হলো প্যালেস্টাইনের জর্ডন নদী। খৃষ্টানদের কাছে নদীটি খুবই পবিত্র। কারণ তাঁরা মনে করেন, ভগবান যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার আগে এই নদীতেই স্নান করানো হয়েছিল। যীশুকে স্নান করানোর ফলেই এই নদীতে কোনও মাছ নেই—এই ধারণাটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল। নদীতে মাছ না থাকার কারণটা হলো এই নদীর জলে পটাশ ও ক্ষার এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, মাছেরা কোন অবস্থাতেই বাঁচতে পারে না। তাই নদীটি মৎস্যশূন্য।

বিষাক্ত উপত্যকা

জাভায় এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। কোন প্রাণী ঐস্থানে গেলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ছটফট করতে করতে মারা যায়। ভূ-বিজ্ঞানীরা এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন, এখানকার মাটি থেকে সবসময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয়। এই ঘটনা অন্যত্র দেখা যায় না। এর ফলে এই স্থানের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি। এই কারণে অধিকক্ষণ এখানে কেউ থাকতে পারে না। জায়গাটির ইংরেজি নাম 'পয়জন্ ভ্যালী'।

পিঁপড়ের সারি

পিঁপড়েরা যখন কোন দেওয়াল বেয়ে অথবা মাটির ওপর দিয়ে সার বেঁধে চলে, তখন প্রথম পিঁপড়েটা যেখানে যেভাবে চলে পরের পিঁপড়েগুলোও ঠিক সেই পথে বেঁকে চলে। পিঁপড়েদের শরীর থেকে একরকম রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'ফেরোমোন্স্'। প্রথম পিঁপড়ের দেহ থেকে বার-হওয়া ঐ রাসায়নিক বস্তুর গন্ধ অনুসরণ করেই সারির পরবর্তী পিঁপড়েরা এগিয়ে চলে। তাই দেখে মনে হয়, ওদের চলার পথ যেন একটা বাঁধা রাস্তা।

যে লতা মানুষ মারে

আফ্রিকার জঙ্গলে বিজ্ঞানীরা একরকম ভয়ংকর লতার সন্ধান পেয়েছেন। এই লতার রং কালো। পাতাগুলো খুব ছোট। এক একটা লতার পাঁচ থেকে ছয়টা পাতা থাকে। এই লতার নাম 'সিসিয়া'। এক থেকে দু হাতের মধ্যে কোন মানুষ পেলে চুম্বকের মতো টেনে নেয় এবং অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে মোচড়াতে থাকে। দেহের হাড় ভেঙ্গে মানুষটি মারা যাওয়ার পরে লতার বাঁধন আলগা হয়। এই লতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণারত।

অফুরন্ত লবণ

সমুদ্রকে লবণের ভাণ্ডার বলা যায়। প্রতি বছরই নদনদীর স্রোতের মাধ্যমে সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে লবণ জমা হয়। পাহাড়-পর্বতের গা দিয়ে যখন নদ-নদীগুলি বয়ে যায়, তখনই তাদের স্রোত বেয়ে প্রচুর লবণ চলে আসে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সমুদ্রের জলে মোট পাঁচশো কোটি টনেরও বেশি লবণ আছে। সমুদ্র থেকে সমস্ত লবণ তুলে ভূ-ভাগে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে আমরা দেড়শো মিটার লবণের তলায় ডুবে যাব।

107 উলটাডাঙা মেন রোড, কলি -76

ম্যাজিক

মানসকুমার সাহা

মিঠু সেদিন দুপুরবেলা ওর মা'র জন্যে পান কিনতে যাওয়ার সময়ে দেখলো বটতলায় একটা জটলা। ও এগিয়ে গেল জটলাটার দিকে। দেখতে পেলো একটা টেবিলে রঙীন কাপড়, টিনের বাক্স, লাঠি, তাস, দেশলাই কতগুলো লাল, নীল, সাদা জলের বোতল নিয়ে একটা লোক ম্যাজিক দেখাচ্ছে। মিঠু ভুলে গেল পান কিনে আনার কথা। ও দেখতে লাগলো লোকটির ম্যাজিক। লোকটি নানারকম ম্যাজিক দেখানোর পর একটা গ্লাসে কিছুটা নীল জল ঢেলে নিল। একটা বিদ্‌ঘুটে মন্ত্র পড়ে সে তার মধ্যে কিছুটা সাদা জল দিল। কি অবাক কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে জলটা লাল হয়ে গেল। লোকটি আবার কিছুটা লাল জল নিয়ে তার মধ্যে একটা বোতল থেকে কিছুটা সাদা জল নিয়ে ঢেলে দিল এবং জলটা নীল হয়ে গেল। মিঠু খুব অবাক হয়ে গেল! হঠাৎ ওর বাড়ির কথা মনে পড়ল। ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল। ওর মা দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ও ম্যাজিকের কথা খুলে বললো। শুনে ওর মা হেসে বললো, ওই লাল ও নীল জলের বোতল দুটোতে ছিল লাল ও নীল লিটমাস দ্রবণ। তার মধ্যে অ্যাসিড ও ক্ষার ফেলার ফলে সেগুলোর রং পরিবর্তন হয়েছিল। এবার মিঠু ব্যাপারটা বুঝতে পারলো।

25 কালী বিশ্বাস রোড, কাঁচড়াপাড়া, 24 পরগনা

নিজে কর

খেলনা ওয়্যারলেস

দেবাশিস কর্মকার

আজ তোমাদের একটা মজার জিনিস তৈরী করা শেখাবো। এর নাম ওয়্যারলেস্। এটা যদি করতে চাও, তবে তোমাদের এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি যে কোনো রেডিওর দোকানেই পেয়ে যাবে।

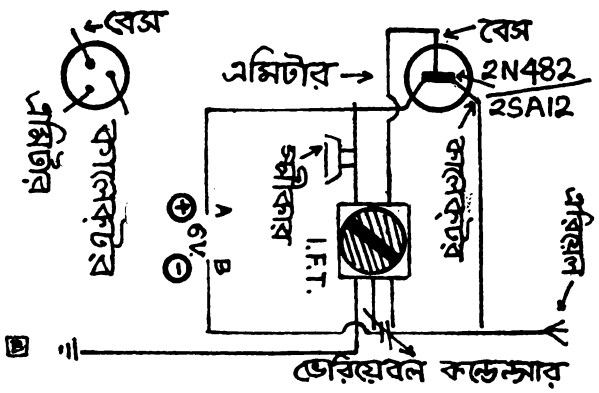

1. একটি ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সার P.V. C 2 J
2. একটি I. F. T. (সিলিকান্)
3. একটি ট্রেন্‌জিস্টর 2N482 অথবা 2SA12 (BEL)
4. কিছু তার
5. একটি খুব ছোটো স্পীকার 8π

এবার কাজ শুরু করো। প্রথমে I.F.T-এর যেদিকে দুটি পয়েন্ট আছে তার একটির সঙ্গে ট্রেনজিস্টরের বেস্ ও অন্য প্রান্তের সঙ্গে স্পীকার যুক্ত করো। তারপর এমিটারের সঙ্গে স্পীকারের অন্য প্রান্ত যুক্ত করো। এবার যেদিকে তিনটি পয়েন্ট আছে সেদিকে প্রথম ও মাঝেরটির সঙ্গে ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সার যুক্ত করো এবং প্রথমটি কালেক্টরের সঙ্গে যুক্ত করো। এবং তৃতীয়টি আর্থ করো ও কালেক্টরের সঙ্গে এরিয়েল সংযুক্ত করো। এরপর ট্রেনজিস্টরে এমিটারের সঙ্গে ব্যাটারির পজিটিভ ও I.F.T-এর মাঝের পয়েন্টের সঙ্গে নেগেটিভ যোগ করো।

এবার স্পীকারে কথা বলো, কাছাকাছি সব রেডিওতে শোনা যাবে।

অষ্টম শ্রেণী, নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুল, নদীয়া

শব্দ দূষণ

সুব্রত ঘোড়ই

আজ আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে, যেমন বায়ু দূষণ, জল দূষণ এবং শব্দ দূষণ।

উৎসবের দিনে হাড়ে হাড়ে টের পাই শব্দ দূষণের ভয়াবহতা। শব্দের উৎপীড়নই শব্দ দূষণের মূল কারণ। এর প্রতিকার করার জন্যে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার আগের কথা, সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে যে প্রচণ্ড উদাসীন তা বোঝানো দরকার।

শব্দের তীব্রতা মাপা হয় 'ডেসিবেল' (db) এককে। তীব্রতার সর্বনিম্ন মান যা সুস্থ কাণে শুনতে পাই, তার পরিমাণ 10^{-16} ওয়াট, এর দশ গুণ বেশি শক্তিপ্রবাহকে 'বেল' বলা হচ্ছে। সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে বেশি বলে এর দশম ভাগ এক 'ডেসিবেল'। আমাদের সাধারণ কথাবার্তা 60 ডেসিবেল, রেলগাড়ির চলার শব্দ 90 ডেসিবল পর্যন্ত। এতে আমাদের মানসিক দুর্বলতা, অনিদ্রা, মাথাধরা ও খিটখিটে মেজাজের করে দেয়।

110 ডেসিবেল বা এর বেশি আওয়াজ কর্ণপটাহের পক্ষে হানিকর। গবেষণায় দেখা গেছে, 85 থেকে 90 ডেসিবেল শব্দ মানুষ এবং পশুপক্ষীর পক্ষে বিপজ্জনক। এই সমস্ত অপ্রীতিকর শব্দ শরীর ও মনের ক্ষতি করে, রক্তচাপ বৃদ্ধি, বদহজম, মাথা ধরা, শোনার অসুবিধা এবং নিয়মিত হলে দেহের A. C. T. H. হরমোন ক্ষরণের দরুন চাপা উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্বল্য আসে। শব্দ যখন 160 ডেসিবেল পৌঁছায় (যেমন বড় রকমের বিস্ফোরণ) তখন বধির করে দেয়। শব্দের এই দৌরাত্ম্য রোধে আমরা কয়েকটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি— (1) মাইকের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ, (2) মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা, (3) অহেতুক শব্দ উৎপাদক বাজি-পটকা নিষিদ্ধ করা, 4) বাস, মিনিবাস ও লরির অতি তীব্র ও ইলেকট্রিক হর্ন নিষিদ্ধ করা ও (5) যানবাহনের শব্দরোধক এয়ার কম্‌প্রেসার যন্ত্রের ব্যবস্থা করা।

এখনিই আমাদের দেশে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ প্রতিকার করার থেকে এই শব্দদূষণ প্রতিকার করার প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে কম নয়, বরং বেশিই।

ফোটন সায়েন্স সেণ্টার, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর

"দারিদ্র্য দূর করার যাদুমন্ত্র একটিই
আর তা হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সুস্পষ্ট
ধারণা নিয়ে শৃংখলাবোধের সঙ্গে
কঠোর পরিশ্রম করা।"

—ইন্দিরা গান্ধী

সত্যমেব জয়তে—শ্রমেব জয়তে

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • March 1983 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
- ক্ষীরের পুতুল ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

নতুন বই ! ছবির বই !! খেলার বই

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৮·০০

বাক্সের মধ্যে বই ও এক বাক্স খেলার সরঞ্জাম

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২